তওহীদ
জান্নাতের চাবি

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

www.hezbuttawheed.org

হেযবুত তওহীদ
মানবতার কল্যাণে নিবেদিত

তওহীদ জান্নাতের চাবি

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

তওহীদ প্রকাশন

তওহীদ প্রকাশন
১৩৯/১ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

তওহীদ জান্নাতের চাবি
হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

অনুলিখন: মোহাম্মদ আসাদ আলী
প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি, ২০১৮
প্রচ্ছদ: মনিরুল ইসলাম চৌধুরী

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়:
তওহীদ প্রকাশন
১৩৯/১ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
০১৭১১-০০৫০২৫, ০১৯৩৩-৭৬৭৭২৫
০১৭৮২-১৮৮২৩৭, ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩

ওয়েবসাইট: www.hezbuttawheed.org
ইমেইল: hezbuttawheed1995@gmail.com

ফেসবুক পেজ:
Hossain Mohammad Salim | facebook.com/emamht
আসুন সিস্টেমটাকে পাল্টাই | facebook.com/systempaltai
ইউটিউব:
www.youtube.com/hezbuttawheed

সরাসরি ভিজিট করতে স্মার্ট ডিভাইস থেকে স্ক্যান করুন

ISBN: 978-984-34-3927-7

মূল্য: ৩০.০০ টাকা মাত্র

তওহীদ জান্নাতের চাবি

পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থগুলো একমত যে মানুষ সৃষ্টির বহু আগে স্রষ্টা এই বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই বিশাল সৃষ্টিকে শাসন ও পরিচালনা করে চলেছেন অসংখ্য মালায়েক দিয়ে; যাদের আমরা ফারসিতে বলি ফেরেশতা, আর ইংরেজিতে অ্যাঞ্জেল (Angel)|

এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ইচ্ছা হলো এমন একটি সৃষ্টি করার যারা পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবে। আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রয়োজন তাঁর গুণাগুণের অধিকারী হওয়া, সেজন্য তিনি সেই সৃষ্টির মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। পবিত্র কোরআনে সুরা বাকারার ৩০ নম্বর আয়াতে এ বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছেন এভাবে- আল্লাহ তাঁর মালায়েকদের বললেন আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই; তখন তারা (মালায়েকরা) বললেন- 'কী দরকার তোমার প্রতিভূ সৃষ্টি করার? **ওরাতো পৃথিবীতে ফাসাদ, অশান্তি আর রক্তপাত করবে**। অথচ আমরা প্রতিনিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। আল্লাহ বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না।'

এরপর আল্লাহ নিজ হাতে আদমকে তৈরি করলেন (সুরা সাদ: ৭৫)। নিজের রূহ থেকে আদমের মধ্যে রূহ ফুঁকে দিলেন (হিজর: ২৯)। ফলে আদম হলো আল্লাহর গুণে গুণান্বিত এবং ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন এক অনন্য সৃষ্টি। অতঃপর তিনি মালায়েকদের হুকুম করলেন আদমকে সেজদাহ করতে (বাকারা: ৩৪)। আদমকে সেজদা করার অর্থ হলো তাকে নিজেদের চাইতে 'শ্রেষ্ঠ' বলে মেনে নেয়া। আল্লাহর হুকুম মেনে নিয়ে সকল ফেরেশতা আদমকে সেজদাহ করে তাঁর সেবায় নিয়োজিত হলেন। কিন্তু ইবলিস সেজদাহ করল না। সে অহংকার করে আল্লাহর হুকুম অমান্য করল, স্বভাবতই ইবলিসের এই ধৃষ্টতা আল্লাহ মেনে নিলেন না।

আল্লাহর হুকুমের অবাধ্য হয়ে ইবলিসের হাজারো এবাদত-উপাসনা নিষ্ফল হয়ে গেল। ইবশিস অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হলো।

এরপরের ঘটনা সংক্ষেপে এই যে, ইবলিস আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিল, 'তোমার যে সৃষ্টির কারণে আমাকে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত করলে, আমাকে যদি সেই সৃষ্টির দেহ-মনের মধ্যে ঢুকে প্ররোচনা দেবার শক্তি দাও, তাহলে আমি প্রমাণ করে দিব, ঐ সৃষ্টি তোমাকে ইলাহ বা হুকুমদাতা হিসেবে মানবে না। আমি তাদের সরল পথে ওঁত পেতে বসে থাকব এবং তাদেরকে সামনে থেকে, পেছনে থেকে, ডানদিক থেকে ও বামদিক থেকে ছিনিয়ে নিতে আসব' (সুরা আরাফ: ১৬-১৭)। আল্লাহ ইবলিসের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তাকে আদমের দেহ, মন, মস্তিষ্কে প্রবেশ করার শক্তি দিলেন (বাকারা: ৩৬, নিসা: ১১৯)।

এরপর আল্লাহ আদমের জন্য তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন, তাদের জান্নাতে বাস করতে দিলেন একটিমাত্র নিষেধ আরোপ করে। কিন্তু ইবলিস তাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে আল্লাহর ঐ একটিমাত্র নিষেধকেই অমান্য করালো। এর শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তাদের উভয়কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নির্বাসন দিলেন। এ সময় তিনি বললেন, 'যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোনো হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে তার কোনো ভয় নেই' (বাকারা: ৩৮)। কিসের ভয় নেই? ঐ যে মানুষ সৃষ্টির সময় মালায়েকরা অন্যায় অশান্তি রক্তপাতের ভয় করেছিল, আল্লাহর দেয়া হেদায়েতের অনুসরণ করলে সেই অন্যায় অশান্তিতে পড়ে যাবার ভয় নেই।

এখানে একটি বিষয় ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার যে, মানুষ সৃষ্টির বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে মালায়েকরা বলেন নি যে, মানুষ নামাজ পড়বে না, রোজা রাখবে না, উপাসনালয়ে যাবে না। বরং তারা নির্দিষ্ট করে ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা অর্থাৎ অন্যায়, অবিচার, রক্তপাতের কথা বলেছেন। তার মানে মানুষের মূল সমস্যাটা নামাজ-রোজায় নয়, উপাসনায় নয়, মূল সমস্যা হচ্ছে তার শান্তিতে বসবাস করায়। আর এ কথা যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ মানবজাতির ইতিহাসের দিকে এক নজর তাকালেই বোঝা যায়। ইতিহাসের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানবজীবনের মূল সমস্যাই ছিল অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত। আজকে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কোনো না কোনো ধর্মে বিশ্বাস রাখছে। কেউ মসজিদে যাচ্ছে, কেউ মন্দিরে যাচ্ছে, কেউ গীর্জায় যাচ্ছে, কেউ প্যাগোডায় যাচ্ছে। সবাই চেষ্টা করছে যার যার ধর্মের উপাসনা, আনুষ্ঠানিকতা নিখুঁতভাবে পালন করতে। কিন্তু কোনোভাবেই মানবজাতি শান্তিতে বসবাস করতে পারছে না। কারণ আর কিছুই নয়, একটাই, জাতিগতভাবে সমস্ত মানুষ আল্লাহর হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করে বসে আছে। তারা আল্লাহর দেয়া হেদায়েতের পথ অনুসরণ না করে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক,

অর্থনৈতিক, বিচারিক জীবন পরিচালনা করছে নিজেদের তৈরি জীবনব্যবস্থা দিয়ে। ইবলিস আল্লাহর সাথে এ চ্যালেঞ্জটাই করেছিল। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ যত ইচ্ছা ধর্মকর্ম করুক, ইবলিসের তাতে আপত্তি নেই, তার চাওয়া এটুকুই যেন জাতীয় জীবনে মানুষ আল্লাহর হুকুম-বিধান অস্বীকার করে। আর এটুকু করলেই অনিবার্যভাবে মানুষ অশান্তিতে পতিত হবে, ইবলিস বিজয়ী হবে। অন্যদিকে আল্লাহর অভিপ্রায় হচ্ছে মানুষ যাতে তাদের সমষ্টিগত জীবনে অন্য কারো দেখানো পথ বা সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে, একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

এক নজরে মানবজীবন

আমরা যদি সামগ্রিক ঘটনাটিকে এক নজরে দেখার চেষ্টা করি তাহলে আদম সৃষ্টি থেকে শুরু করে মানুষের পৃথিবীতে আগমন পর্যন্ত সময়কে একটি ভাগে ফেলতে পারি- এই ভাগের নাম দেওয়া যাক 'আদম সৃষ্টিপর্ব'। দ্বিতীয় ভাগটি হচ্ছে মানুষের পৃথিবীর জীবন অর্থাৎ এখন যেটা চলছে, যার সমাপ্তি ঘটবে কেয়ামতের মাধ্যমে- এটার নাম হচ্ছে 'পরীক্ষাপর্ব' (ত্বোয়া-হা: ১৩১)। আর তৃতীয় ভাগটি হচ্ছে কেয়ামতের পরের জীবন অর্থাৎ জান্নাত বা জাহান্নাম- এই ভাগের নাম হতে পারে 'হাশরপর্ব'।

আদম সৃষ্টিপর্বের ঘটনা এতক্ষণ বলে এসেছি। হাশরপর্বের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, আল্লাহ যে একটিমাত্র সৃষ্টিকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে নিজ হাতে তৈরি করলেন; যুক্তির শক্তি, বুদ্ধির শক্তি, উপলব্ধির শক্তি দিলেন; সেই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি পেয়ে ঐ সৃষ্টি কী করল, আল্লাহকে হুকুমদাতা হিসেবে মেনে নিল, নাকি অহংকারবশত অস্বীকার করল- এই সিদ্ধান্তের পরিণতিই তার হাশর। বাকি রইল পরীক্ষাপর্ব, যে সময়টি আমরা অতিক্রম করছি।

পৃথিবী আমাদের পরীক্ষাকেন্দ্র। যেহেতু পরীক্ষার জন্য বিপক্ষশক্তি প্রয়োজন, কাজেই আল্লাহ ইবলিস বা শয়তানকে সেই বিপক্ষশক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। এই 'পরীক্ষাপর্বে' মানুষের সামনে দুইটি দিক- ডান ও বাম, সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায়। একদিকে আল্লাহর হুকুম, অন্যদিকে ইবলিসের প্ররোচনা। একদিকে আল্লাহর দেখানো পথ হেদায়াহ অর্থাৎ তওহীদ, অন্যদিকে ইবলিসের প্ররোচনায় আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে মানুষের মনগড়া মত, পথ, তন্ত্র, মন্ত্র ইত্যাদি অর্থাৎ দালালাত। যেহেতু পথ দুইটি, কাজেই পৃথিবীতে অবস্থাও মোটের উপর দুইটি- শান্তি ও অশান্তি। তাই হাশরে পরিণতিও দুইটি- জান্নাত ও জাহান্নাম।

আল্লাহ ও ইবলিসের এই চ্যালেঞ্জে মাঝখানটায় আছে মানবজাতি। মানুষের ইচ্ছাশক্তিই তার পরীক্ষা। সে কোনদিকে যাবে এই সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হবে। সে

আল্লাহকে জয়ী করবে নাকি ইবলিসকে? আল্লাহকে জয়ী করতে চাইলে আল্লাহর তওহীদের স্বীকৃতি দিতে হবে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা চলবে না। যদি তওহীদ অস্বীকার করে অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা হয় অথবা অন্ততপক্ষে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করা হয় তাহলেই ইবলিস বিজয়ী হয়ে যাবে।

ইবলিস তার সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করে চলেছে মানুষকে আল্লাহর দেখানো পথ (সেরাতুল মোস্তাকীম) অর্থাৎ তওহীদ থেকে সরিয়ে দালালাতে নিক্ষেপ করতে। সেই প্রথম মানুষটি থেকেই ইবলিসের সমস্ত প্ররোচনার লক্ষ্যবস্তু ছিল এটাই। উপাসনা, আরাধনা, আনুষ্ঠানিকতা করতে বাধা দেওয়া ইবলিসের লক্ষ্য নয়, কারণ ওসবের সাথে তার জয়-পরাজয় সরাসরি নির্ভর করে না। তার বিজয় কেবলমাত্র আল্লাহর তওহীদকে অস্বীকার করাতে পারলে। তাই ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানুষ যখনই ইবলিসের ধোঁকায় পা দিয়ে ঐ কাজটি করেছে তখনই তাদের জীবনে নেমে এসেছে অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত এক কথায় অশান্তি। আর যখন মানুষ ইবলিসের প্ররোচনাকে উপেক্ষা করে তওহীদের স্বীকৃতি প্রদান করেছে তখন তাদের জীবন শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠেছে।

প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির ইতিহাস এই সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, তওহীদ-শেরক, হেদায়াহ-দালালাতের দ্বন্দ্বের ইতিহাস, এক কথায় বললে আল্লাহ ও ইবলিসের সার্বভৌমত্বের দ্বন্দ্বের ইতিহাস।

সার্বভৌমত্ব কী?

এখানে সার্বভৌমত্বের ব্যাপারটি ভালোমত বুঝে নেওয়া দরকার আছে। কারণ সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে মানবজাতির কাছে আল্লাহর দাবি ও ইবলিসের প্ররোচনার স্বরূপ বোঝা যাবে না। মানুষ সামাজিক জীব, আর সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে গেলেই একটি জীবনবিধানের প্রয়োজন পড়ে। একটি জীবনব্যবস্থা বা দীন ছাড়া সে পৃথিবীতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে না। সেই জীবনব্যবস্থায় আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, সমাজবিধি সবই যেমন থাকতে হবে, তেমনি থাকতে হবে একটা সার্বভৌমত্বও। কারণ যখনই আইন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি বা যে কোনো ব্যাপারেই কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে তখনই একটা সার্বভৌমত্বের প্রয়োজন হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অপরাধ দমনের জন্য হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়া ঠিক কিনা; কিংবা সমাজের সম্পদ সঠিক এবং সুষ্ঠু বিতরণের জন্য অর্থনীতি সুদভিত্তিক হওয়া সঠিক কিনা? যদি এমন প্রশ্ন ওঠে তাহলে সিদ্ধান্ত কি হবে? নেতা-নেত্রীগণ যদি এসব বিষয়ে আলোচনা, পরামর্শ, যুক্তি-তর্ক করেন তবে সেটা অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে– কোনো

সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না। কারণ এইসব বিষয়ে প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন মতামত আছে। একদল বলবেন– হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড আইন না করলে সমাজ থেকে হত্যাকাণ্ড নির্মূল হবে না, বেড়েই চলবে; আরেক দল বলবেন– মৃত্যুদণ্ড বর্বরোচিত, নৃশংসতা, এ কখনো আইন হতে পারে না; আরেক দল হয়তো বলবেন- একটি হত্যাকাণ্ডের জন্য মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে একাধিক হত্যাকাণ্ডের জন্য মৃত্যুদণ্ড উচিত। এমন হাজারো মতামত আসতে থাকবে।

অনুরূপভাবে সমাজের অর্থনীতি সুদভিত্তিক হওয়া সঠিক না লাভ-লোকসানভিত্তিক হওয়া উচিত এ নিয়ে বিতর্কেরও কোনোদিন অবসান হবে না। কাজেই যে কোনো জীবনব্যবস্থাতেই শেষ সিদ্ধান্ত নেবার জন্য একটি স্থান থাকতেই হবে। **এই শেষ সিদ্ধান্ত নেবার ও দেবার কর্তৃত্ব ও অধিকারই হচ্ছে সার্বভৌমত্ব।**

আল্লাহ মানুষের জন্য একটা জীবন–ব্যবস্থা দিয়েছেন যাকে তিনি বলেছেন দীন, তিনি নিজেই সে দীনের সার্বভৌম। এই দীনের মধ্যেই তিনি মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, সমাজ-নীতি, সব দিয়েছেন। মানুষ যদি স্রষ্টার ঐ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে সেটা অনুযায়ী তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবন পরিচালিত করে তবে সে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে মেনে নিলো। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের এই ঘোষণাই হচ্ছে 'তওহীদ'- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অর্থাৎ জীবনের যে অঙ্গনে আল্লাহর কোনো কথা আছে, আদেশ, নিষেধ আছে, সেখানে অন্য কারোটা মানব না, এই সাক্ষ্য দেওয়া।

অন্যদিকে ইবলিসের প্ররোচনায় আল্লাহর তওহীদ অস্বীকার করে মানবজাতিকে নিজেদের ইচ্ছেমত একটি জীবনব্যবস্থা তৈরি করে নিতে হবে। আর এই নতুন জীবনব্যবস্থা তৈরি করতে গেলেই সেখানে অবশ্যই একটি শেষ সিদ্ধান্তের স্থান, অধিকার থাকতে হবে; এবং যেহেতু স্রষ্টার সার্বভৌমত্বকে ত্যাগ করা হলো, সেহেতু এই শেষ সিদ্ধান্তের স্থান, কর্তৃত্ব অধিকার (Authority) হতে হবে সৃষ্টির অর্থাৎ মানুষের। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ এতখানি সামর্থ্য দেন নি যা দিয়ে সে নিজের জন্য নিখুঁত ও ভারসাম্যযুক্ত একটি দীন তৈরি করে নিতে পারে, যা তার পরিবার থেকে শুরু করে সামাজিক, জাতীয়, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রের সুষ্ঠু সমাধান করবে। কাজেই সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতে তুলে নেওয়ার অর্থই হচ্ছে অনিবার্য অন্যায়, অত্যাচার, যুদ্ধ, রক্তপাতে নিমজ্জিত হওয়া এবং ইবলিসের বিজয়ী হয়ে যাওয়া। তওহীদের গুরুত্বটা মূলত এখানেই। যেখানে তওহীদ থাকবে সেখানে সার্বভৌমত্ব থাকবে আল্লাহর, বিজয় হবে আল্লাহর, মানবজীবন হবে শান্তিপূর্ণ। আর যেখানে তওহীদ থাকবে না, সার্বভৌমত্ব চলে যাবে ইবলিসের হাতে, বিজয়ী হবে ইবলিস, মানবজীবন হবে অশান্তিপূর্ণ।

সর্বযুগেই দীনের ভিত্তি ছিল 'তওহীদ'

আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধি আদমকে (আ.) সৃষ্টি করে তাঁর স্ত্রীসহ পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়ার সময় বলেছিলেন তিনি হেদায়াহ দিয়ে পথ-প্রদর্শক পাঠাবেন সেই হেদায়াহর অনুসরণ করলে কারো ভয় নেই (বাকারা ৩৮)। যে হেদায়াহ পাঠাবার অঙ্গীকার আল্লাহ করেছেন তাতে যে তিনি ব্যর্থ হবেন না তা স্বাভাবিক। যুগে যুগে লক্ষাধিক নবী-রসুল পাঠিয়ে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, মানুষকে দেখিয়েছেন হেদায়াহ বা সঠিক পথ- এ বিষয়ে কোনো বিতর্কের সুযোগ নেই। এখন দেখা দরকার সেই হেদায়াহ কী ছিল?

পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেবার পর তিনি আদমকে (আ.) দিলেন তাঁর জীবনব্যবস্থা। আমরা ধরে নিতে পারি এ ব্যবস্থা ছিল ছোট, সংক্ষিপ্ত। কারণ তখন অল্প সংখ্যক নর-নারীর জন্যই ব্যবস্থা দিতে হয়েছিলো। আদম (আ.) এবং তার পুত্র কন্যা ও নাতি-নাতনিদের জন্য এবং সমস্যাও নিশ্চয়ই ছিলো সীমিত। কিন্তু তারপর আল্লাহর হুকুম মোতাবেক বংশবৃদ্ধি চলল। সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে আদমের (আ.) সন্তানরা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল, ফলে একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। গায়ের রং, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির বৈচিত্র্য বা ভিন্নতা এলো ভৌগোলিক আবহাওয়ার কারণে। কিন্তু তারা মূলত একই বাবা-মা আদম-হাওয়ার সন্তান। সেই সূত্রে তারা ভাই-বোন, এক জাতি। এই মানবজাতির স্রষ্টা আল্লাহ কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁর দায়িত্ব ভুলে গেলেন না। বনি-আদমের বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীতে তিনি তাঁর নবী-রসুল পাঠিয়ে তাদের জন্য জীবনব্যবস্থা দিতে থাকলেন। এমন কোনো জনপদ নাই যেখানে নবী-রসুল আসেন নি (সুরা ফাতির: ২৪)। এদিকে ইবলিস অর্থাৎ শয়তানও ভুলল না তার চ্যালেঞ্জের কথা। সেও প্রতিটি বনী-আদমের দেহ-মনের মধ্যে বসে তাকে নানা রকম বুদ্ধি পরামর্শ দিতে থাকল, নতুন নতুন উপায় বাতলাতে থাকল, যাতে মানুষ তওহীদের চুক্তি থেকে সরে আসে এবং অন্যায়, ফাসাদ আর রক্তারক্তিতে জড়িত হয়ে পড়ে। যখনই ইবলিস কোনো জনসমাজে সফল হয়েছে তখনই আল্লাহ সেখানে নতুন একজন নবী-রসুল পাঠিয়েছেন সেটাকে সংশোধন করতে। প্রশ্ন হচ্ছে, বিভিন্ন নবীদের মাধ্যমে, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ যে জীবনব্যবস্থা পাঠালেন সেটা মূলত কী?

পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় দীনের মূল ভিত্তি হচ্ছে- স্রষ্টাকে, আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ, হুকুমদাতা, বিধানদাতা, সর্বময় প্রভু বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করা, অর্থাৎ তওহীদ। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে দীনের আইন বিধানে পরিবর্তন এসেছে মাত্র। একজন নবীর উম্মতের জন্য যেটা বৈধ ছিল, অন্য নবী-রসুলের উম্মতের জন্য সেটা অবৈধ করা হয়েছে। যেমন আদম (আ.) এর শরীয়তে ভাই বোনের

মধ্যে বিয়ে জায়েজ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যখন মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন আর ভাই-বোনের বিয়ে দরকার পড়ল না, ভাই বোনের বিয়ে নিষিদ্ধ হয়ে গেল। পরিবর্তন হলো শুধু দীনের আইন-কানুন, বিধানের ব্যাপারে। কিন্তু আদম (আ.) থেকে মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর সময় দীনের মূলমন্ত্র কিন্তু পরিবর্তন করা হলো না। যেমন আদম (আ.) এর সময় মূলমন্ত্র ছিল– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আদম শাফিউল্লাহ, মূসা (আ.) এর সময় ছিল– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মূসা কালিমুল্লাহ; ইবরাহীম (আ.) এর সময় হলো– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ইবরাহীম খলিলুল্লাহ; ঈসা (আ.) এর সময়- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ঈসা রূহুল্লাহ এবং শেষ নবী মোহাম্মদ (স.) এর সময় হলো- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ। সবসময়ই সাক্ষ্য দেওয়া হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, শুধু কালভেদে যোগ হলো তদানীন্তন নবীর নাম।

কলেমার মূলমন্ত্রে আল্লাহ কখনো 'ইলাহ' শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করেন নি। যেমন কোনো নবীর সময় লা রব্ব ইল্লাল্লাহ বা লা মালেক ইল্লাল্লাহ বা লা মাবুদ ইল্লাল্লাহ বা তাঁর অন্য কোনো নাম ব্যবহার করেননি। প্রত্যেক নবীই তাদের জাতির মধ্যে এসে প্রথমে কলেমা তওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন (আম্বিয়া ২৫)। সেই জাতি তওহীদ গ্রহণ করার পরেই কার্যকর হয়েছে দীনের আইন, কানুন, শরীয়ত, যেটা ঐ সময়ে ঐ স্থানের জন্য প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু একসময় এসে এই স্থান-কাল পাত্রের সীমাবদ্ধতা আর থাকল না। মানবজাতি তার চিন্তা চেতনা, জ্ঞান-বুদ্ধিতে এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হলো যে, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ একটিমাত্র দ্বীনের অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করার যোগ্যতা লাভ করল।

মানবজাতি যখন এই সময়ে এসে উপনীত হলো তখন আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের নবী করে পাঠালেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সা.) কে। ফলে স্বভাবতই আখেরী নবীর সাথে পূর্ববর্তী নবীদের আনিত দীনের কিছু পার্থক্য থাকতে হলো। তার মধ্যে অন্যতম পার্থক্যটি হলো এই দীনে তিনি এমন কোনো হুকুম-বিধান, আইন-কানুন রাখলেন না যেটা স্থান-কাল-পাত্রভেদে অকার্যকর হয়ে যায়। দীনে সেটাই রাখা হলো যা সকল যুগে, সকল স্থানে, সকল পরিবেশে প্রয়োগ করলে একই ফল হয়, আর তা হচ্ছে শান্তি (ইসলাম)। এই যে পার্থক্যটুকু কিন্তু দীনের মূলমন্ত্রে এলো না, এলো আইন-কানুন, বিধি-বিধানে। মূলমন্ত্র এই দীনেও সেটাই থাকল যেটা পূর্ববর্তী নবীদের আনীত দীনের মূলমন্ত্র ছিল, অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং তারপর যোগ হলো আখেরী নবীর নাম মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (স.)। নব্যুয়তপ্রাপ্ত হয়েই আল্লাহর রসুল জনগণকে সমবেত করে যে কথাটি বললেন তা হচ্ছে, তোমরা বলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাহলে সফলকাম হবে। এরপর থেকে মক্কার তেরোটি বছর বিশ্বনবী মানুষকে শুধুমাত্র তওহীদের দিকেই ডেকে গেছেন

এবং কেমন সেই আহ্বান? শত নির্যাতন নিপীড়ন বিদ্রুপ অপমান উপেক্ষা করে, খেয়ে না খেয়ে, গাছের লতা-পাতা খেয়ে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে। এই সময়ে যেসব সাহাবী ইন্তেকাল করেন তারা ইসলাম বলতে কী পেয়েছিলেন? তারা নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, ঈদ, কোরবানি কিছুই পেয়েছিলেন কি? তারা পেয়েছেন শুধুমাত্র তওহীদ এবং বলার অপেক্ষা রাখে না তওহীদই তাদের সফলকাম হয়ে জান্নাতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট ছিল।

তওহীদের ঘোষণার সঙ্গে যে সফলতার অঙ্গীকার জড়িত সেই সফলতা কেবল পরকালের নয়, ইহকাল-পরকাল উভয় জগতের সফলতা। মানুষদেরকে তওহীদের দিকে আহ্বান করার সময় রসুলাল্লাহ তাদেরকে এই সুসংবাদও দিয়েছেন যে, তওহীদ গ্রহণ করলে তারা পার্থিব জীবনে অকল্পনীয় সমৃদ্ধি, উৎকর্ষ, প্রগতি, ক্ষমতা, রোমান পারস্য পরাশক্তিধর জাতিগুলোর উপর আধিপত্য লাভ করবে।

এ প্রসঙ্গে সে সময়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। রসুলাল্লাহর চাচা আবু তালিব যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর মুমূর্ষু অবস্থা সম্পর্কে যখন কোরাইশরা অবহিত হলো, তখন উতবা, শায়েবা, আবু জেহেল, উমাইয়া, আবু সুফিয়ান প্রমুখ প্রভাবশালী গোত্রপতিগণ সহ কোরায়েশদের বিশেষ ব্যক্তিগণ আবু তালিবের কাছে গিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক, সে তো আপনি জানেন। আপনি এখন মৃত্যুশয্যায়, আপনার জন্য এখন আমরা উদ্বিগ্ন। আপনার ভাতিজার সঙ্গে আমাদের একটু গোলমাল আছে, সে-ও আপনি জানেন। আপনি এখন তাকে ডাকুন, আমরা একটা আপস করি এই বলে যে, সে আমাদের কোনো কিছুতে থাকবে না, আমরাও তার কোনো কথায় থাকব না। তার ধর্ম তার থাকবে, আমাদের ধর্ম আমাদের।'

রসুলাল্লাহ এলে পরে আবু তালিব বললেন, 'প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! এই এঁরা গণ্যমান্য মানুষ সব, এঁরা এসেছেন, তোমাকে এঁরা কিছু দেবেন এবং তোমার কাছ থেকে কিছু নেবেন।' তিনি বললেন, 'জ্বি, আপনারা আমাকে এমন একটা শব্দ দেন, যার দ্বারা আপনারা আরবদের শাসন করতে পারবেন এবং পারসিকরা আপনাদের পদানত হবে।'

আবু জেহেল বলল, 'হায়, এমন দশটা শব্দ হলেও চলবে।'

রসুলাল্লাহ বললেন, "আপনাদের বলতে হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং আপনারা আল্লাহর সঙ্গে আর যাদের উপাসনা আপনারা করেন, তাদের ত্যাগ করতে হবে।' এ কথা শুনেই আরবি রীতি মোতাবেক তারা তাদের হাত দিয়ে তালি বাজালো। বলল, 'সব দেবতাদের মিলিয়ে তুমি কি একটা দেবতা বানাতে চাও, মোহাম্মদ? সে তো সাংঘাতিক একটা কিছু হবে।' তারপর তারা পরস্পরকে বলল,

"তোমরা যা চাও, তার কিছুই এই লোক তোমাদের দেবে না। কাজেই যাও, গিয়ে তোমাদের পিতা-পিতামহের ধর্ম আচরণ করো, তারপর একদিন আল্লাহ আমাদের মধ্যে ভালো বিচার করে দেবেন।" এই বলে তারা চলে গেল। আল্লাহর রসুলের এই কথা যে মিথ্যা ছিল না বরং কলেমার ঘোষণার উপর ঐক্যবদ্ধ জাতিটি যে শুধু রোমান সাম্রাজ্য নয়, অর্ধেক পৃথিবীই তাদের পদানত হয়েছিল তা ইতিহাস। তওহীদ এমনই এক শক্তিশালী ঘোষণা যা মানুষকে উভয় জগতেই সফলতার চূড়ায় আরোহণ করায়।

প্রকৃতপক্ষে সত্য এই যে, আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রসুলদের মাধ্যমে যে হেদায়াহ পাঠাবার অঙ্গীকার করেছিলেন, প্রতিটি জনপদে লক্ষ লক্ষ নবী-রসুল পাঠিয়ে মানুষকে যে সহজ-সরল পথ দেখিয়েছেন ইসলামের মূলমন্ত্র কলেমায়ে তওহীদই সেই হেদায়াহ, সেরাতুল মোস্তাকীম। মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবনে ভুল-ভ্রান্তি ও গুনাহ করবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু যদি তারা তওহীদের স্বীকৃতি দিয়ে হেদায়াতে অটল থাকে তাহলে তাদের ভয় নেই, ব্যক্তিগত কোনো গুনাহই তাদেরকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। এবং ইবলিস, যে কিনা আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছে সে আল্লাহর দেওয়া সহজ-সরল পথে ওঁত পেতে বসে থাকবে, মানুষের সামনে থেকে, পেছন থেকে, ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে আক্রমণ করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করবে (আরাফ: ১৬-১৭) তার মূল লক্ষ্য আর কিছু নয়, মানুষকে দিয়ে তওহীদ, হেদায়াহ অস্বীকার করিয়ে তাকে শেরক ও কুফরে নিমজ্জিত করা এবং তার মাধ্যমে ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা সৃষ্টি করে আল্লাহকে দেওয়া চ্যালেঞ্জে জয়ী হওয়া।

কোর'আন ও হাদিসে কলেমা তওহীদের গুরুত্ব

পবিত্র কোর'আনের সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হচ্ছে তওহীদ। কোর'আন-হাদীসের সর্বত্র তওহীদের যে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে তা স্বভাবতই অন্য কোনোকিছুতে নেই। শত শত আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন আসমান জমিনের একমাত্র ইলাহ হচ্ছেন আল্লাহ। তিনি মানবজাতিকে উপদেশ দিয়েছেন একমাত্র তাঁকেই ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করতে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে। সবগুলো আয়াত উল্লেখ করতে গেলে লেখার কলেবর বড় হয়ে যাবে। আমরা কেবল কয়েকটি আয়াত পাঠকদের সামনে তুলে ধরব, আশা করি চিন্তাশীল ও সত্যনিষ্ঠ পাঠকরা এই কয়টি আয়াতেই সত্যের সন্ধান পেয়ে যাবেন-

- পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ বলেন, যারা তওবা করে **ঈমান আনে (তওহীদে)** এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুন্য দ্বারা পরিবর্তীত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (ফোরকান: ৭০)

- 'তিনি চিরঞ্জীব, **তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই,** অতএব তোমরা তাঁকেই ডাকো, তাঁর প্রতি আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। (মু'মিন: ৬৫)'
- আপনি তারই অনুসরণ করুন, যা আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি ওহী হয়। **তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।** আর আপনি মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। (আন'আম: ১০৬)
- তারা তাদের আলেম ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে। এবং মরিয়মের পুত্রকেও। **অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র ইলাহর ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।** তারা যে শিরক করে তা থেকে তিনি পবিত্র। (তওবা: ৩১)
- তোমরা গ্রহণ করো না দুইজন ইলাহকে; **তিনিই একমাত্র ইলাহ।** (নাহল: ৫১)
- আপনার পূর্বে আমি সকল রসুলকে এই আদেশই প্রেরণ করেছি যে, **আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই।** (আম্বিয়া: ২৫)
- **তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ।** সুতরাং তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর এবং বিনীতদেরকে সুসংবাদ দাও (হাজ্জ: ৩৪)
- আর তিনিই আল্লাহ, **তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।** দুনিয়া ও আখেরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই; আর হুকুমের অধিকার তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে (কাসাস: ৭০)
- বলুন হে আহলে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে এসো, যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান, তা এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং **একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে প্রভু বানাব না।** তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, 'সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত।' (ইমরান: ৬৪)
- আর তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, **শরীক কর না তাঁর সাথে অন্য কাউকে।** (নিসা: ৩৬)
- যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্নপর্যায়ের সমস্ত পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। **আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে তো মহাপাপ করল।** (নিসা: ৪৮)
- **নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে,** আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (মায়েদা: ৭২)

- এসো, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তা এই যে, **আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না . . .** (আন'আম: ১৫১)

এছাড়া বোখারী, মুসলিমসহ বহু হাদিস পেশ করা যায় যেগুলোতে রসুল (স.) বলেছেন আল্লাহর সার্বভৌমত্বে, সেরাতুল মুস্তাকীমে অর্থাৎ তওহীদে যে ব্যক্তি অটল থাকবে, বিচ্যুত হবে না, পৃথিবী ভর্তি গোনাহও তাকে জান্নাত থেকে ফেরাতে পারবে না। আল্লাহর নবী বলেছেন- বান্দাদের সাথে আল্লাহর চুক্তি (Contract) হচ্ছে যে তারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইলাহ হিসেবে মানবে না, তাহলেই আল্লাহ তাদের কোনো শাস্তি দেবেন না (জান্নাতে প্রবেশ করাবেন) [হাদিস - মো'য়াজ (রা.) থেকে বোখারী, মুসলিম]। তিনি আরও বলেছেন- যে হৃদয়ে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মোহাম্মদ (সা.) তাঁর রসুল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন [হাদিস- ওবায়দাহ বিন সোয়ামেত (রা.) ও আনাস (রাঃ) থেকে বোখারী, মুসলিম]। তিনি আরেক জায়গায় বলেছেন, জান্নাতের চাবি হচ্ছে তওহীদ [হাদিস- মু'য়ায বিন জাবাল (রাঃ) থেকে আহমদ], যদিও বর্তমানে বিকৃত আকীদার কারণে নামাজকে জান্নাতের চাবি বলে প্রচার করা হয়। আনাস (রা.) বলেন 'আমি রসুলাল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! যদি তুমি জমিন ভর্তি গুনাহ করে থাক, তারপর যে অবস্থায় তুমি আমার সাথে কাউকে শরিক করোনি সে অবস্থায় তুমি আমার নিকট আসলে, আমি তোমার কাছে জমিন ভর্তি ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব [আনাস রা. থেকে তিরমিযি]'।

একদিন আবু তালীব শাতবুল মামদুদ (রা.) রসুলাল্লাহর কাছে এলেন অথবা অন্য বর্ণনায় একজন খুবই বৃদ্ধ ব্যক্তি লাঠিতে ভর দিয়ে রসুলাল্লাহর নিকট এলেন যার চোখের পাতা তার চোখের সাথে লেগে গিয়েছিল। তিনি রসুলাল্লাহর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেন, যদি কোনো লোক সব ধরনের পাপ করে থাকে, এমন কোনো পাপ নেই যা সে করেনি অর্থাৎ ছোট বড় সব ধরনের পাপই করেছে; তার পাপ যদি দুনিয়াবাসীর উপর বণ্টন করে দেয়া হত তাহলে তাদেরকে ধ্বংস করে দিত। এর কি তওবা করার সুযোগ রয়েছে? এই কথা শুনে আল্লাহর রসুল শুধু নিশ্চিত হতে চাইলেন যে, তিনি তওহীদের ঘোষণা দিয়েছেন কিনা। তিনি হ্যাঁসূচক জবাব দিলে রসুল (সা.) তাকে ভালো কাজ করা ও মন্দ কাজ পরিহার করার উপদেশ দিয়ে নিশ্চয়তা দিলেন যে, তার সব পাপকে কেবল ক্ষমা করে দেওয়া হবে তাই নয়, সেগুলোকে পূন্য দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে দেওয়া হবে। (তবারানী, বাজ্জার; আল-মুনজেরী তারগীব গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, এর সনদ মজবুত ৪/১১৩; ইবনে হাজার ইসাবা গ্রন্থে বলেন, হাদিসটি শর্ত মোতাবেক রয়েছে ৪/১৪৯)।

ইবনে হিববান এবং আল হাকেম আবু সাইদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রসুলাল্লাহ বলেন, 'মুসা (আ.) একবার আল্লাহকে বললেন, হে আল্লাহ, আমাকে এমন একটি বিষয় শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি আপনাকে সবসময় স্মরণ করব এবং আপনাকে আহ্বান করব। আল্লাহ বললেন, মুসা তুমি বলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। মুসা (আ.) বললেন, এটা তো আপনার সকল বান্দাই বলে থাকে। আল্লাহ বললেন, হে মুসা, আমি ব্যতীত সপ্তাকাশ ও এর মাঝে অবস্থানকারী সকল কিছু এবং সপ্তজমিন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে আরেক পাল্লায় রাখা হয় তাহলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পাল্লা বেশি ভারী হবে।' ঠিক একই ধরনের আরেকটি হাদীস পাওয়া যায় আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) এর বর্ণনায়। আল্লাহর রসুল বলেন, কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে সকল মানুষের সামনে ডাকা হবে, তার সামনে নিরানব্বইটি (পাপের) পুস্তক রাখা হবে এবং একেকটি পুস্তকের পরিধি হবে চক্ষু দৃষ্টির সীমারেখার সমান। এরপর তাকে বলা হবে, এই পুস্তকে যা কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে তা কি তুমি অস্বীকার কর? উত্তরে ঐ ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ আমি তা অস্বীকার করি না। তারপর বলা হবে, এর জন্য তোমার কোনো আপত্তি আছে কিনা? অথবা এর পরিবর্তে তোমার কোনো নেক কাজ আছে কিনা? তখন সে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বলবে, না তাও নেই। অতঃপর বলা হবে, আমার নিকট তোমার কিছু পূন্যের কাজ আছে এবং তোমার উপর কোনো প্রকার অত্যাচার করা হবে না, অতঃপর তার জন্য একখানা কার্ড বের করা হবে তাতে লেখা থাকবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। তখন ঐ ব্যক্তি বিস্ময়ের সাথে বলবে, 'হে আল্লাহ, এই কার্ড খানা কি নিরানববইটি পুস্তকের সমতুল্য হবে?' তখন বলা হবে, 'তোমার উপর কোনো প্রকার অত্যাচার করা হবে না। এরপর ঐ নিরানববইটি পুস্তক এক পাল্লায় রাখা হবে এবং ঐ কার্ড খানা এক পাল্লায় রাখা হবে, তখন ঐ পুস্তকগুলোর ওজন কার্ড খানার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য হবে এবং কার্ডের পাল্লা ভারী হবে। (আত তিরমিযি, হাদিস নং ২৬৪১। আল হাকেম ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫-৬)

আরেক বর্ণনায় দাহিয়া কালবী নামের একজন সাহাবীর তওহীদ গ্রহণের ঘটনা পাওয়া যায়। তিনি সত্তরজন জীবন্ত কন্যা সন্তানকে হত্যা করেছিলেন। তিনি যখন আল্লাহর রসুলের কাছে তওহীদের ঘোষণা দিতে আসলেন, আল্লাহর রসুল প্রথমত তাকে নিশ্চয়তা দিলেন যে, তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে কিন্তু যখন জানতে পারলেন এই লোক এত নির্মম হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটিয়েছে তখন তিনিও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন, যে এতবড় পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন কিনা। অতঃপর জিবরাইল (আ.) এসে রসুলকে আশ্বস্ত করলেন যে, যে মুহূর্তে দাহিয়া কালবী বলেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সেই মুহূর্তে তার অতীত জীবনের ছোট-বড়

সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।' এভাবে বহু হাদিস দেখানো যায় যেগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তওহীদের ঘোষণা দিলে আর কোনো পাপ, কোনো ব্যক্তিগত অপরাধই মানুষকে জান্নাত থেকে ফেরাতে পারে না। আরও একটি হাদিস উল্লেখ না করে পারছি না। একদিন রসুলাল্লাহ বললেন, 'যে ব্যক্তি বলল আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই সে জান্নাতে যাবে।' আবু যার (রা.) বললেন, যদি সে চুরি ও ব্যভিচার করে তবুও জান্নাতে যাবে? আল্লাহর রসুল বললেন তবুও জান্নাতে যাবে। এ কথায় সাহাবী কতটা বিস্মিত হলেন তা বোঝা যায় এ থেকে যে, তিনি বারবার রসুলকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন- চুরি ও ব্যভিচার করার পরও? তখন আল্লাহর রসুল বললেন, হ্যাঁ, সে চুরি করলেও, ব্যভিচার করলেও, এমনকি আবু যরের নাক মাটিতে ঘষে দিলেও (হাদিস: বোখারী ও মুসলিম)।

এভাবে কোর'আনের আয়াত ও হাদীসের বাণী বহু উল্লেখ করা যায়। কোর'আন হাদিসের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে আল্লাহর উলুহিয়্যাত ও রব্যুবিয়াতের ঘোষণা। যারা বোঝার সামর্থ্য রাখেন তাদের জন্য সবগুলো উল্লেখের দরকার নেই, উপরোক্ত আয়াত ও হাদিস কয়টিই যথেষ্ট হবে। আর যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন যে, তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে, বোঝালেও বুঝবে না, দেখালেও দেখবে না, তারা কোর'আন হাদিসের মহাপণ্ডিত হয়ে গেলেও তওহীদের গুরুত্ব বুঝবেন না। কাজেই তাদের জন্য হেদায়াত কামনা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই আমাদের।

হেযবুত তওহীদ কেন তওহীদের ডাক দিচ্ছে?

প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কেন তওহীদের গুরুত্ব প্রচার করছি? এই যে কোর'আনের আয়াত ও হাদিসগুলো উল্লেখ করা হলো, যেগুলোতে দেখা যাচ্ছে কেবল তওহীদের স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে ছোট ছোট অপরাধ তো বটেই, এমনকি চুরি, ব্যভিচার, হত্যা সমস্ত অপরাধকেই ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে- এই আয়াতগুলো ও হাদীসগুলো তো কমবেশি সবাই জানেন। কোর'আনে ও হাদীসে যেহেতু উল্লেখ আছে, কাজেই লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিনিয়ত পড়ছেন, আলেমরা মোহাদ্দীসরা মোফাস্সিররা এগুলোর শানে নজুল বের করছেন, বই লিখছেন, ব্যাখ্যা করে ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদিতে জনগণকে শোনাচ্ছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ পাড়া কাঁপিয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র জিকিরও করে চলেছেন প্রতিনিয়ত। একজন মুসলিমও খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- এই কথা স্বীকার করেন না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাঁর রসুলের মাধ্যমে তওহীদের বাণী পাঠালেন, সমস্ত পৃথিবী থেকে অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, সেই শান্তির দেখা মিলছে না। সমস্ত পৃথিবী আজ ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমায় ভর্তি এবং আজকের মত এত অন্যায়, অপরাধ, অশান্তি মানবজাতির

যে তওহীদ তথা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ঘোষণার ভিত্তিতে আল্লাহর রসুল উম্মতে মোহাম্মদী নামক ঐক্যবদ্ধ মহাজাতি গড়ে তুলেছিলেন, সেই তওহীদ থেকে আজ সবাই বিচ্যুত হয়ে গেছে। তারা বিভিন্ন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে আজ পৃথিবীর দুর্বলতম জাতিতে পরিণত হয়েছে।

আবার কে এই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করবে? কে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে উম্মতে মোহাম্মদী নামক সেই মহাজাতি গড়ে তুলবে? এই কাজটিই করে যাচ্ছে হেযবুত তওহীদ। হেযবুত তওহীদ নতুন কোনো দল বা ফেরকা নয়, বরং সমস্ত ফেরকা-মাজহাবের প্রাচীর ভেঙে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করাই হেযবুত তওহীদের কাজ।

ইতিহাসে আর কখনও ঘটে নি। এখানেই আমাদের মূল বক্তব্য। আমরা কেন তওহীদের গুরুত্ব তুলে ধরতে এতটা সচেষ্ট হয়েছি তার জবাব পেতে হলে আগে এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি দরকার যে, কলেমা তওহীদের যে ঘোষণা দিলে যাবতীয় অন্যায়, অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা সেই কলেমা লক্ষ-কোটি বার পাঠ করা সত্ত্বেও তা কেন আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারছে না?

দুইটি উত্তর হতে পারে। হতে পারে আল্লাহ ইবলিসের চক্রান্ত থেকে বাঁচার জন্য যুগে যুগে নবী-রসুল পাঠিয়ে এবং সর্বশেষ আখেরী নবী মোহাম্মদ (সা.) কে পাঠিয়ে বনি আদমকে যে তওহীদের রাস্তা দেখিয়েছেন সেটা শান্তি আনতে ব্যর্থ হয়েছে (নাউজুবিল্লাহ), আর যদি তা না হয় (অবশ্যই তা হবার নয়, কারণ আল্লাহ হচ্ছেন সোবহান, ত্রুটিহীন, তাঁর বিধান ব্যর্থ হতে পারে না। ব্যর্থ যে হয় নি তার প্রমাণ উম্মতে মোহাম্মদীর ইতিহাস) তাহলে এটাই দাঁড়ায় যে, আল্লাহর রসুল যে তওহীদের ঘোষণা দিয়েছেন, যে তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন, সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন, কাফের মোশরেকদের দ্বারা প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, নির্যাতিত-নিপীড়িত হয়েছেন এবং যে তওহীদ প্রতিষ্ঠার ফলে অর্ধপৃথিবী থেকে যাবতীয় অন্যায়, অবিচার, অনিরাপত্তা দূর হয়ে গিয়েছিল সেই তওহীদ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তৃতীয় কোনো সিদ্ধান্ত হতে পারে না।

আমরা জানি এই যৌক্তিক কথাটি অনেকেই সহজভাবে মেনে নিতে পারবেন না। আর পারবেন না বলেই আমরা যখন জাতিকে তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানাই, তখন অনেকেই অভিযোগের সুরে বলেন, 'আমরা তো আল্লাহর একত্ববাদে ঈমান রাখি, আল্লাহর প্রতি ঈমান আছে বলেই আমরা নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, হজ্ব করি, যাকাত দিই, মিলাদ মাহফিল করি। ঈমান না থাকলে তো আমল করতাম না। তাহলে হেযবুত তওহীদ কেন আমাদেরকে আবার কলেমা তওহীদে ঈমান আনতে বলে?'

এখানেই তারা সাংঘাতিক ভুলটি করেন। তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখেন এতে সন্দেহ নেই। আল্লাহ আসমান-জমিন, গ্রহ-নক্ষত্র, বৃক্ষরাজি, তরুলতা সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছেন, মানুষকেও সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের রিজিকদাতা, পালনকর্তা এতেও সন্দেহ নেই। এই বিশ্বাস আছে বলেই তো বিবিধ প্রকার আমল করা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই বিশ্বাস থাকা মানেই কি তওহীদে ঈমান থাকা? আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকলেই এবং নামাজ রোজাসহ বহু উপাসনা করলেই যে কেউ মো'মেন হয়ে যায় না তা পরিষ্কার হয়ে যায় রসুলের একটি হাদিস থেকে। রসুল (সা.) আখেরী জামানা সম্পর্কে বলেছেন, এমন সময় আসবে যখন- (১) ইসলাম শুধু নাম থাকবে, (২) কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে, (৩) মসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ ও লোকে লোকারণ্য হবে কিন্তু সেখানে হেদায়াহ

থাকবে না, (৪) আমার উম্মাহর আলেমরা হবে আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব, (৫) তাদের তৈরি ফেতনা তাদের ওপর পতিত হবে। [হযরত আলী (রা.) থেকে বায়হাকী, মেশকাত]।

পাঠক খেয়াল করুন- রসুল (সা.) কী বললেন? এত নামাজী থাকবে যে, মসজিদ লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে এবং নামাজ পড়াকে বা আল্লাহর উপাসনা করাকে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হবে তা বোঝা যায় এই থেকে যে, মসজিদগুলোকে জাঁকজমকপূর্ণ করে ফেলা হবে। কিন্তু আল্লাহর রসুল বললেন এতকিছু করেও তারা হবে পথভ্রষ্ট, তাদের মধ্যে হেদায়াহ থাকবে না। হেদায়াহ হচ্ছে সঠিক পথ (right direction), একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া অর্থাৎ এই হাদীসে যাদের কথা বলা হচ্ছে তারা খুব ভালো মুসল্লি হবে বটে, কিন্তু আল্লাহকে তারা একমাত্র ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে নিবে না। তাদের ইলাহ হবে মানুষের তৈরি বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র। আরেকটি হাদিসে আল্লাহর রসুল বললেন, 'এমন সময় আসবে মানুষ রোজা রাখবে কিন্তু তা হবে কেবল উপবাস (রোজা কবুল হবে না), তাহাজ্জুদ পড়বে কিন্তু তা হবে কেবল ঘুম নষ্ট করা (নামাজ কবুল হবে না) [আবু হোরায়রা (রা.) থেকে সুনানে ইবনে মাজাহ]।'

প্রথমত, এই হাদিসে আল্লাহর রসুল রোযা ও তাহাজ্জুদ না বলে অন্য কোনো আমলের কথাও বলতে পারতেন। কিন্তু বেছে বেছে ফরদ আমলগুলোর মধ্যে তিনি রোযার কথা বললেন এবং নফলগুলোর মধ্যে তাহাজ্জুদের কথা বললেন কেন? কারণ এই দুইটি আমল এমন যা কখনও লোক দেখানোর জন্য করা যায় না, একমাত্র আল্লাহর প্রতি মোকাম্মাল ঈমান থাকলেই তা সম্ভব। আল্লাহর রসুল বোঝালেন তিনি যাদের ব্যাপারে কথাগুলো বলেছেন তাদের গলদটা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসে নয়, আন্তরিকতায় নয়, তাদের গলদ অন্যখানে!

দ্বিতীয়ত, কোর'আন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা পূর্বে দেখে এসেছি যে, আল্লাহ কেবল তাদের আমলকেই কবুল না করার ঘোষণা দিয়েছেন যারা তওহীদের স্বীকৃতি দিবে না। অতএব এই হাদিসে যাদের কথা আল্লাহর রসুল বলেছেন তারা ব্যক্তিগত জীবনে মোকাম্মাল বিশ্বাসী হলেও আল্লাহ মানুষের কাছে যে তওহীদের স্বীকৃতি চান সেই জায়গায় তারা হবে ব্যর্থ। তারাও তওহীদহীন মুসল্লিদের মতই তওহীদহীন রোজাদার ও তওহীদহীন তাহাজ্জুদী! প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে?

এই প্রশ্নেরই উত্তর আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাঁর এক বান্দা এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর মাধ্যমে মানবজাতিকে দান করেছেন। তিনি আজ থেকে বাইশ বছর আগেই বই লিখে প্রকৃত তওহীদকে মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছেন এবং সেই তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের

যাত্রা শুরু হয়েছে। এমামুয্যামান বলেছেন, বর্তমানে পৃথিবীর কোথাও প্রকৃত তওহীদ প্রতিষ্ঠিত নেই এবং তওহীদের যে ধারণা পৃথিবীময় অধিকাংশ মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে চালু আছে সেটা বিকৃত ও আংশিক ধারণা। বর্তমানে কলেমায় ব্যবহৃত আরবি 'ইলাহ' শব্দের অর্থ করা হয় 'উপাস্য'। তওহীদের কলেমার অর্থ করা হয় আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহ তো অবশ্যই উপাস্য, কিন্তু এটা এই দীনের মূলমন্ত্র কলেমা নয়, যে মূলমন্ত্রের স্বীকৃতি দিলে অন্য কোনো গুনাহের কাজ কাউকে জান্নাত থেকে ফেরাতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে ইলাহ হচ্ছেন সেই সত্তা যার হুকুম মানতে হয় (He who is to be obeyed), জীবনের যে অঙ্গনে তাঁর কোনো বক্তব্য আছে সেখানে অন্য সকল হুকুম প্রত্যাখ্যান করতে হয়, অর্থাৎ সর্বময় হুকুমদাতা। যেমন অর্থনৈতিক অঙ্গনে আল্লাহর হুকুম হচ্ছে সুদ হারাম। কাজেই যারা আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ বা হুকুমদাতা হিসেবে গ্রহণ করবেন তাদের অর্থনৈতিক জীবন হবে সুদমুক্ত। তারা সুদভিত্তিক বা সুদসংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করবেন এবং আল্লাহ যে ব্যবস্থা নাজেল করেছেন সেটাকে কার্যকর করবেন। একইভাবে আল্লাহ জাতির মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। কাজেই তওহীদে যাদের ঈমান আছে তারা এমন কোনো রাজনৈতিক সামাজিক বা পারিবারিক ব্যবস্থাকে নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না যেটার কারণে জাতির মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হয়। এক কথায় 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' এই কলেমার অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিজীবন থেকে আরম্ভ করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, বিচারিক ইত্যাদি জীবনের সমস্ত অঙ্গনে আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতা-বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া এবং আল্লাহর হুকুমপরিপন্থী সমস্ত হুকুম, বিধান, ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করা। এটা আল্লাহর সাথে বান্দার চুক্তি (contract)। মৃত্যু পর্যন্ত যারা এই চুক্তি বলবৎ রাখবে তারা হবে তওহীদের সাক্ষ্যদানকারী, স্বীকৃতিদানকারী; তাদের জান্নাত নিশ্চিত। অন্যদিকে এই তওহীদের বিপরীতে শেরক সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন- আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন, কিন্তু শেরক অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হুকুম মেনে নেওয়াকে কখনই ক্ষমা করবেন না (নিসা: ৪৮)। এমনকি নবী-রসুলদের মধ্যেও যদি কেউ শেরক করতেন তাহলে তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যেত (আন'আম: ৮৮)। শেরক কতটা অমার্জনীয় অপরাধ তা আরও পরিষ্কার বোঝা যায় যখন কোর'আনে আল্লাহ তাঁর সবচাইতে প্রিয় বান্দা তাঁর আখেরী নবীকেও সতর্ক করে বলে দিচ্ছেন- হে নবী, আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহি করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহর সঙ্গে আপনি অংশীদার স্থাপন করেন, তাহলে আপনার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন (সুরা যুমার: আয়াত ৬৫)। এত গর্হিত অপরাধ শেরক, অথচ পৃথিবীময় ১৬০ কোটি মো'মেন, মুসলিম, উম্মতে মোহাম্মদী দাবিদার জাতিটি কীভাবে তাতে আপাদমস্তক ডুবে আছে এবং

তার কারণে আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পৃথিবীর সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর দ্বারা নির্যাতিত, নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, অপমানিত ও গণহত্যার শিকার হয়ে নিশ্চিহ্ন হবার প্রহর গুনছে তা সামনে দেখাব ইনশা'আল্লাহ।

আল্লাহকে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও আরবরা মোশরেক ছিল যে কারণে

অনেকে মনে করেন যাদের মধ্যে বিশ্বনবী এসেছিলেন তারা বোধহয় আল্লাহর অস্তিত্বেই বিশ্বাস করত না, আল্লাহর উপাসনা করত না, মূর্তিপুজা করতো অর্থাৎ শিরক করতো। এ কারণেই তারা ছিল কাফের-মোশরেক। বিষয়টি মোটেও তা নয়। তারাও আল্লাহকে বিশ্বাস করত, কথায় কথায় আল্লাহর নামে কসম করত (সিরাতে ইবনে ইসহাক)। আল্লাহকে সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা বলে জানত। এ কথার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ দিচ্ছেন। তিনি তাঁর রসুলকে বলছেন- তুমি যদি তাদের (আরবের অধিবাসীদের) জিজ্ঞাসা কর আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তবে তারা অবশ্যই জবাব দেবে- সেই সর্বশক্তিমান মহাজ্ঞানী (আল্লাহ) [কোরান- সুরা যখরুফ, আয়াত ৯]। অন্যত্র বলছেন- তুমি যদি তাদের প্রশ্ন কর আকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন এবং কে সূর্য ও চাঁদকে (তাদের কর্তব্যকাজে) নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রণ করছেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ (সুরা আন্‌কাবুত, আয়াত ৬১)। আল্লাহ আবার বলছেন- যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা কর- মাটি (পানির অভাবে শুকিয়ে যেয়ে) মরে যাবার পর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে কে তাকে আবার পুনর্জীবন দান করেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে- আল্লাহ (সুরা আন্‌কাবুত, আয়াত ৬৩)। তিনি আবার বলছেন- যদি তাদের প্রশ্ন কর- কে এই মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তবে তারা অবশ্যই জবাব দেবে- আল্লাহ (সুরা লোকমান, আয়াত ২৫)। প্রশ্ন আসতে পারে আল্লাহর প্রতি এতই যখন বিশ্বাস তাহলে তারা মূর্তি বানিয়ে পূজা করত কেন? এর জবাবও আল্লাহ দিয়েছেন। তারা লাত, মান্নাত, হুবাল ইত্যাদিকে স্রষ্টা মনে করত না। এসব দেব-দেবীর মূর্তি বানিয়ে পূজা করত এই আশায় যে, এরা আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবে (ইউনুস: ১৮) এবং আল্লাহর সান্নিধ্য (কুরবিয়াত) এনে দেবে (যুমার: ৩)।

তারা ইবরাহীমকে (আ.) আল্লাহর নবী বলে বিশ্বাস করত; নিজেদের মিল্লাতে ইবরাহীম বলে বিশ্বাস করত; ইবরাহীম (আ.) দ্বারা পুনর্নির্মিত কাবাকে আল্লাহর ঘর বলে বিশ্বাস করত; কাবার দিকে মুখ করে সালাহ (নামাজ) কায়েম করত; কাবাকে কেন্দ্র করে বছরে একবার হজ্ব করত; কাবা তওয়াফ (পরিক্রমা) করত; সেখানে যেয়ে আল্লাহর রাস্তায় পশু কোরবানি করত; বছরে একমাস, রমাদান মাসে সওম (রোযা) পালন করত; এমন কি প্রত্যেকে ইবরাহীমের (আ.) সময় থেকে চালু হওয়া খাত্‌না পর্যন্ত করত। তারা প্রতি কাজে আল্লাহর নাম নিত, দলিল ইত্যাদি লিখতে বিয়ে-শাদীর কাবিন লিখতে তারা প্রথমেই ওপরে আল্লাহর নাম

লিখে আরম্ভ করত। আমরা যেমন এখন লেখি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম', তারা লিখত 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা'। একই অর্থ। কিন্তু এতকিছুর পরও তারা কাফের, মোশরেক ছিল কারণ তারা তাদের সর্বময় জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বদলে কাবার ঐ তিনশ' ষাটটি মূর্তির পুরোহিতদের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছিল। ধর্মগুরু আলেমরা আর সমাজপতিরা তাদের মনগড়া যে বিধান দিত তাই তারা অনুসরণ করত। আর তা করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন বাদ-মতবাদ, দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক গোত্র বা দল নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ ভাবত এবং অন্যকে পরাজিত করে সমস্ত স্বার্থ নিজেদের অনুকূলে নেওয়ার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করত। সমাজের মানুষগুলো চরম আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতার মধ্যে ডুবে ছিল। মানুষ মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতো। নারীদের ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। দাসদেরকে মানুষ মনে করা হতো না। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অন্যায়, অবিচার, চুরি, ডাকাতি, যুদ্ধ, রক্তপাতে ভরে গিয়েছিল তাদের সমাজ। এক কথায় মানবতার চূড়ান্ত অধঃপতনে নিমজ্জিত ছিল আরবরা। আল্লাহর রসুল এসে যখন ঘোষণা দিলেন- আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা (ইলাহ) নেই, তখন ঐ পুরোহিতদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগল। সমাজপতিরা, ধর্মের ধ্বজাধারীরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আল্লাহর রসুল ও তাঁর মুষ্টিমেয় অনুসারীর উপর অকথ্য নির্যাতন নিপীড়ন চলতে থাকল। সেদিন আল্লাহর রসুল যদি সর্বাঙ্গীন জীবনের তওহীদের দিকে আহ্বান না করে আজকের বিকৃত আকীদায় আমরা যেমন আল্লাহকে কেবল ব্যক্তিগত জীবনের উপাস্য বলে মনে করি কিন্তু জাতীয় জীবনে কার হুকুম, বিধান চলছে তা নিয়ে মাথা ঘামাই না- আল্লাহর রসুলও যদি তেমন ব্যক্তিগত জীবনের উপাসনার দিকে ডাকতেন তাহলে আর যাই হোক তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে নির্যাতিত হতে হত না।

ঐ আরবদের মধ্যেই কিছু লোক ছিল তারা মূর্তিপূজা করাকে ঘৃণ্য কাজ মনে করত যেমনটা আমরা বর্তমানে মনে করি। তাদের মধ্যে একজনের নাম জায়েদ ইবনে আমর। ইবনে ইসহাক রসুলাল্লাহর জীবনীগ্রন্থে এই জায়েদ ইবনে আমর সম্পর্কে লিখেছেন যে, **'তিনি নিজের বাপ-দাদার ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করে মূর্তি, মৃত প্রাণী ও রক্ত ভক্ষণ এবং প্রতিমাকে অর্ঘ্যদান ইত্যাদি বিষয় থেকে বিরত থাকতেন। বলতেন, তিনি কেবল ইবরাহিমের উপাস্যকে পূজা করেন। নিজের লোকজনকে প্রকাশ্যে তিনি তাদের আচার-আচরণের জন্য নিন্দা করতেন।'** এই ব্যক্তিকে তো ওতবা, শায়বা, আবু জাহেলরা কিছু বলত না। অন্যদিকে বিশ্বনবীকে সমস্ত রকমের নির্যাতন তো বটেই, শেষাবধি হত্যার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিল। এর কারণ খুব সোজা- জায়েদ ইবনে আমর যেটা করেছিলেন আর আল্লাহর রসুল যেটা করেছিলেন এই উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ রয়েছে। জায়েদ ডাকছিলেন

উপাসনা, আরাধনার দিকে, সমাজ পরিবর্তনের জন্য নয়। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, দরিদ্রের উপর ধনীর বঞ্চনা, শাসিতের উপর শাসকের জুলুম বন্ধ করা ওই আহ্বানের উদ্দেশ্য ছিল না। পক্ষান্তরে আখেরী নবী মানুষকে আহ্বান করছিলেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দিকে, জীবনের সর্বাঙ্গন থেকে অত্যাচারী সবলের, প্রবঞ্চক ধনীর, জালেম শাসকের ও ধর্মব্যবসায়ীদের মনগড়া হুকুম অস্বীকার করে আল্লাহর হুকুম কার্যকরী করার দিকে। যে দাবিকে শয়তান সবচাইতে বেশি ভয় পায়, কারণ এই একটি দাবি গ্রহণ করে নিলেই মানুষের জীবন থেকে অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত ইত্যাদি নির্মূল হয়ে যাবে, মানুষকে পথভ্রষ্ট করিয়ে অশান্তিতে নিমজ্জিত করার চ্যালেঞ্জে সে হেরে যাবে, আল্লাহ বিজয়ী হবেন। এবং ইতিহাস সাক্ষী, নবীজী ও তাঁর সাহাবীগণ চরম নির্যাতন সহ্য করে, অকল্পনীয় ত্যাগ-কোরবানী ও সর্বাত্মক সংগ্রাম করে আরবজাতিকে যখন তওহীদের উপর ঐক্যবদ্ধ করলেন তখন গোটা জাতিটি অভাবনীয়ভাবে বদলে গেল।

চুরি ও ব্যভিচারের মত অপরাধ করেও কেবল তওহীদের স্বীকৃতি দিলেই জান্নাতের নিশ্চয়তা রসুলাল্লাহ (সা.) কেন দিয়েছিলেন তার জবাবটা এখানে নিহিত আছে। কোনো সমাজের মানুষ তওহীদের স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ তারা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক তাদের সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করতে সম্মতি জ্ঞাপন করল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা হিসেবে আল্লাহকে গ্রহণ করে নিল। আর এটা সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে, আল্লাহ ভুল সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। তিনি জানেন কোন নিয়মে এই জগত চলছে, কারণ তিনিই এসবের স্রষ্টা। কাজেই মানুষের সমষ্টিগত জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত যে নিখুঁত ও সঠিক হবে তাতে সন্দেহ নেই। কোনো জনসমষ্টি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ঘোষণা দেওয়ার অর্থ এই যে, তারা কার্যত নিজেদের ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনের জন্য একটি ত্রুটিহীন জীবনব্যবস্থা নির্বাচন করল। এর প্রভাবে প্রথমত তাদের জাতীয় জীবন থেকে অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, রক্তপাত নির্মূল হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়ত জাতীয় জীবনের প্রভাবে ব্যক্তিগত জীবনও পরিশুদ্ধ হয়ে অচিন্তনীয় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন চুরি, ব্যভিচারের সুযোগ থাকলেও মানুষ এসব গর্হিত কাজে জড়াবে না, যে পরিবেশ আজকে আমরা হাজারো আইন-কানুন, দণ্ডবিধি প্রণয়ন করেও তৈরি করতে ব্যর্থ হচ্ছি। ব্যর্থ হচ্ছি তার কারণ আল্লাহ ও রসুল যে তওহীদের স্বীকৃতি দাবি করেন আমরা সেই তওহীদে নেই। সমষ্টিগত জীবনে আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতা হিসেবে গ্রহণ করা আমাদের কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নয়, আমাদের কাছে মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে দীনের খুঁটিনাটি, মাসলা-মাসায়েল, ওজু, গোসল, হায়েজ নেফাজ, ঢিলা, কুলুখ, মেশওয়াক, পাগড়ি, পাঞ্জাবি, টুপি, তসবিহ ইত্যাদি।

আমরা উপাসনা-আরাধনায় আছি, খুব ভালোভাবেই আছি। আমাদের লক্ষ লক্ষ মসজিদ আছে। এসি মসজিদ, টাইলস মসজিদ, সোনার গম্বুজ বসানো মসজিদ। লক্ষ লক্ষ মাদ্রাসা আছে, সেখানে নিখুঁত আরবি শেখানো হয়, ব্যাকরণ শেখানো হয়, কোর'আন-হাদিস, ফেকাহ, তাফসির, মাসলা-মাসায়েল মুখস্থ করানো হয়। এসবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান নিয়ে প্রতিবছর অসংখ্য আলেম, পণ্ডিত বের হন। মিলাদ, মাহফিল, ইজতেমা, হজ্ব ইত্যাদিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েত হয়। অনেকে নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়েন। পাড়া-মহল্লা কাঁপিয়ে জিকির করেন। কিন্তু একটি জায়গায় আমরা ধরা এবং সেই জায়গাটি দীনের একেবারে মূলমন্ত্র, ভিত্তিমূল, যেখানে কোনো আপস চলে না। সেটা হচ্ছে আমরা আল্লাহকে সর্বাঙ্গীন জীবনের একমাত্র হুকুমদাতা, বিধানদাতা অর্থাৎ ইলাহ হিসেবে মানছি না। আমরা আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধানকে কয়েক শ' বছর পূর্বেই পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্যের তৈরি বিধানকে কার্যকর করে নিয়েছি। পাশ্চাত্যের তৈরি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, আইন, কানুন, দণ্ডবিধি দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে আমাদের জাতীয় জীবন। আমাদের ইলাহ এখন আল্লাহ নেই, দীন বা জীবনব্যবস্থাও 'ইসলাম' নেই। আমরা সওয়াবের আশায় কিছু ব্যক্তিগত আমল করে যাচ্ছি, কিন্তু হুকুম মানছি মানুষের!

পূর্বে একটি হাদিস বর্ণনা করেছি যেখানে আখেরী যামানায় কী কী হবে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীতে আল্লাহর রসুল বলেছিলেন, তখন মসজিদসমূহ এমনভাবে পূর্ণ হবে যে, জায়গা পাওয়া যাবে না, কিন্তু সেখানে হেদায়াহ থাকবে না (বায়হাকী)। হেদায়াহ'ই হলো আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ, হুকুমদাতা বলে বিশ্বাস করা, মেনে নেওয়া অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মুসল্লি দিয়ে ভর্তি মসজিদগুলোতে যদি হেদায়াহ'ই না থেকে থাকে তবে সেখানে আর রইল কী? আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ যে আইন, বিধান নাযেল করেছেন তা দিয়ে যারা হুকুম করে না তারাই কাফের, জালেম, ফাসেক (সুরা মায়েদা- ৪৪, ৪৫, ৪৭)। পরিহাসের বিষয় হচ্ছে- আল্লাহর ভাষায় কার্যত কাফের, জালেম, ফাসেক হবার পরেও ব্যক্তিজীবনে আমরা খুব আমল করে যাচ্ছি, নামাজ পড়তে পড়তে কপালে কড়া ফেলে দিচ্ছি, আর ভাবছি- খুব বোধহয় সওয়াবের কাজ করে ফেলছি, মহান আল্লাহ কতই না খুশি হচ্ছেন। এই ঈমানহীন আমল যে আল্লাহ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন সেটা বোঝার সাধারণ জ্ঞানটাও আমাদের লোপ পেয়েছে।

ঈমানহীন আমল অর্থহীনঃ

একজন ব্যক্তি যদি ইসলামে প্রবেশ করতে চায় তাহলে তাকে আপনি সর্বপ্রথম কী করতে বলবেন? আমল করতে বলবেন নাকি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই তওহীদের ঘোষণা দিয়ে ঈমান আনতে বলবেন? অবশ্যই আগে তওহীদে ঈমান, তারপর

আমল। অথচ বাস্তবে আমরা ঠিক উল্টোটি করে চলেছি। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি আমলকে কীভাবে আরও নিখুঁত, অতি নিখুঁত করা যায়, কিন্তু তা ঈমানের দাবি অর্থাৎ তওহীদ থেকে হাজার মাইল দূরে সরে গিয়ে। তার চেয়েও হাস্যকর বিষয় হচ্ছে- এই আমলগুলো করা হচ্ছে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীনভাবে। যেমন- আল্লাহ নামাজের হুকুম দিয়েছেন, তাই আমরা প্রাণপণে নামাজ পড়ে যাচ্ছি, নামাজ কতটা নিয়মমাফিক সহিহ-শুদ্ধভাবে করা যায় তা নিয়ে আমাদের হাজারো চিন্তা। কিন্তু একটিবারও ভাবছি না যে, আল্লাহ নামাজ কাদেরকে পড়তে বলেছেন এবং কী উদ্দেশ্যে বলেছেন?

আল্লাহর রসুল বলেছেন- 'ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ, যথা কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত।' এর মধ্যে কলেমা তওহীদ হচ্ছে ঈমান, আর বাকিগুলো আমল। যিনি কলেমা তওহীদে ঈমান আনবেন তিনি নামাজ পড়বেন, হজ্ব করবেন, যাকাত দিবেন ইত্যাদি অন্যান্য আমলগুলো করবেন। কিন্তু যিনি ঈমানেই নেই তার জন্য কি নামাজ রোজা আগে দরকার নাকি ঈমান আনয়ন আগে দরকার? ঈমান হচ্ছে হেদায়াহ, সঠিক পথ, যে পথে চললে মানুষ ইহকালে পাবে শান্তির ঠিকানা, পরকালে পাবে জান্নাত। আর সেই হেদায়াতের পথে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করে সাবধানে চলার নাম তাকওয়া। আপনার আমল যত নিখুঁত হবে, পথ যত সাবধানে চলবেন অর্থাৎ আপনি যত তাকওয়াবান হবেন তত আপনার জান্নাতের স্তর বাড়বে, আপনি উচ্চ থেকে উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী হবেন। কিন্তু যদি হেদায়াতেই না থাকেন, আপনার পথটাই যদি সেরাতুল মোস্তাকীম না হয় তাহলে সেই পথ তো আপনাকে জান্নাতেই নিতে পারবে না, আপনার তাকওয়া হবে অর্থহীন! উদাহরণস্বরূপ একজন পরীক্ষার্থী যতক্ষণ তেত্রিশ নম্বর না পান ততক্ষণ তিনি কৃতকার্য নন, তার গ্রেডের প্রশ্নই ওঠে না। তেত্রিশ নম্বর পাওয়ার মাধ্যমে তিনি পাশ করেন, অতঃপর বাকি নম্বর দিয়ে নির্ধারিত হয় তার পাশের গ্রেড বা স্তর। এই তেত্রিশ নম্বর হচ্ছে তওহীদে ঈমান অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই ঘোষণা দেওয়া। তওহীদের স্বীকৃতি দেওয়ার পর যত আমল করবেন তত মর্যাদার অধিকারী হবেন, কিন্তু তওহীদেই যদি না থাকেন কোনো আমলই আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না, অর্থহীন হয়ে যাবে, যেমনটা বর্তমানে হচ্ছে।

বর্তমানের বিকৃত আকীদায় ঈমান ও আমলের গুরুত্ব ওলটপালট হয়ে যাওয়ায় মনে করা হয় মানুষ সওয়াবের বিনিময়ে জান্নাতে যাবে। তাই বেশি বেশি আমল করে সওয়াব কামাই করার উপর আলেম-ওলামারা জোর দিয়ে থাকেন। অমুক কাজে এত নেকি, অমুক দোয়ায় এত সওয়াব ইত্যাদি বলে মানুষকে আমলের দিকে আকৃষ্ট করেন। কিন্তু কেউ জানে না কী পরিমাণ সওয়াব কামাতে পারলে বা নেকী করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে। আসলে সওয়াব দিয়ে কারো জান্নাত-জাহান্নাম

নির্ধারণ হয় না, জান্নাত-জাহান্নাম নির্ধারিত হয় ঈমান দিয়ে। যারা যুক্তি দেখিয়ে বলবেন ঈমান তো আমাদের আছে, ঈমান না থাকলে তো লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করে হজ্বে যেতাম না, কষ্ট করে রোজা রাখতাম না ইত্যাদি, তাদের প্রতি জবাব হচ্ছে- এই ঈমান আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমান, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি ঈমান নয়। এই ঈমান যে আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না সে কথা আল্লাহর রসুল নিজেই বলে গেছেন। এ কারণেই রসুল (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন মানুষ রোজা রাখবে কিন্তু না খেয়ে থাকা হবে (অর্থাৎ উপবাস), তাহাজ্জুদ পড়বে কিন্তু ঘুম নষ্ট করা হবে (অর্থাৎ নামাজ কবুল হবে না)। বর্তমানে আমরা সেই সময়টি অতিক্রম করছি তাতে সন্দেহ নেই। আজকের আমাদের যত আমল সব তওহীদহীন আমল, আমাদের তাকওয়া হেদায়াহহীন তাকওয়া, যার সাথে অন্যান্য ধর্মের মানুষের উপাসনা, আরাধনার বিশেষ পার্থক্য নেই।

দীন অত্যন্ত সহজ-সরল

ইসলামকে বর্তমানে যে অবস্থায় এনে দাঁড় করানো হয়েছে তাতে লেখাপড়া না জানা সাধারণ একজন মানুষ যদি দীনকে পুরোপুরি বুঝতে চায়, সেটা তার জন্য এক প্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। কারণ ইসলামের যে রূপরেখাটি আমাদের আলেম সমাজ গত ১৩০০ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তৈরি করেছেন সেটাকে পূর্ণাঙ্গভাবে আয়ত্বে আনা দূরে থাক, ভাসাভাসাভাবে জানতে গেলেও জীবনের বড় একটি সময় মাদ্রাসার বারান্দায় পার করতে হবে। মাদ্রাসায় লেখাপড়া না করে, আরবি ভাষা, ব্যাকরণ, মাখরাজ ইত্যাদি না জেনে, কোর'আন-হাদিসের উল্লেখযোগ্য অংশ মুখস্ত না করে প্রচলিত এই ইসলামকে জানা-বোঝার প্রশ্নই ওঠে না। এটা আলেম-ওলামাসহ সাধারণ ধর্মভীরু মুসলমান, এমনকি সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানরাও বিশ্বাস করেন। সকলের ধারণা ইসলাম অনেক জটিল বিষয়, আমাদের পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব নয়। তাই যারা সারাজীবন ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করেছে তারাই একমাত্র ইসলাম নিয়ে কথা বলার ও মতামত প্রদানের অধিকার রাখেন। এই ধারণা সমগ্র মুসলিম বিশ্বেই এমনভাবে প্রচলিত হয়ে গেছে যে, সাধারণ মানুষ এখন আর ধর্ম নিয়ে ভাবেন না, ভাবার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন না। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আলেম-ওলামারাও এ বিষয়টিকে এতই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন যেন এটাই হবার কথা ছিল। তারা কোর'আন, হাদিস, তাফসির, ফিকাহ ঘেঁটে পাণ্ডিত্য অর্জন করবেন, নতুন নতুন মাসলা-মাসায়েল তৈরি করবেন, আর সাধারণ জনতা তাদের থেকে দীনের মাসলা জেনে নিবেন- এটাই ইসলামের নীতি। আসলেই কি তাই?

সমগ্র কোর'আন খুঁজলে একটি আয়াতও পাওয়া যাবে না যেখানে আল্লাহ কেবল একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষকে দীনের জ্ঞান অর্জন করতে বলেছেন, আর

অন্যদেরকে চোখ-কান বুঁজে সেই শ্রেণির অনুসরণ করতে বলেছেন। একটি হুকুম বিধানও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেটাতে আল্লাহ 'হে আলেমরা' 'হে মুফতিরা' 'হে ফকিহরা' সম্বোধন করেছেন। বরং আল্লাহ কোর'আনে যত হুকুম-বিধান দিয়েছেন তার পূর্বে সম্বোধন করেছেন 'হে মোমেনরা' অর্থাৎ সমগ্র জাতিকেই বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে আমরা ইতিহাসে পাই লেখাপড়া জানা লোক ছিল মাত্র চল্লিশ জন, অনেকে এক হাজারের বেশি যে সংখ্যা থাকতে পারে তাও জানতেন না। কিন্তু সেই জাতি দুর্ধর্ষ দুর্বিনীত লৌহকঠিন ঐক্যবদ্ধ ছিল বিধায় অর্ধ-পৃথিবীতে তওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে পারল। দীন বুঝতে ও মানতে তখন তাদের কারো কোনো অসুবিধা হয় নি, বিশেষ কোনো শ্রেণির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকারও দরকার হয় নি। তারা এতই ভালোভাবে দীনকে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, আল্লাহর রসুল বলেন, আমার আসহাবরা উজ্জ্বল তারকার ন্যায়, তাদের যে কাউকে তোমরা অনুসরণ করতে পারো। এটা সম্ভব হয়েছে তার কারণ আমাদের কাছে ইসলামকে যেভাবে জটিল ও দুর্বোধ্যভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে দীন এমন জটিল ও দুর্বোধ্য ছিল না।

একটি জাতির মধ্যে চালাক-বোকা, মুর্খ-জ্ঞানী সব ধরনের মানুষ থাকবে। সবার বুদ্ধিমত্তা সমান হবে না। কিন্তু আল্লাহর দেওয়া দীন তো সবার জন্য প্রযোজ্য, তাই নয় কি? দীন যদি এমন দুর্বোধ্য হয় যে সমাজের একটি বিশেষ অংশ সেটা বুঝতে পারল কিন্তু অন্যরা প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী না হবার কারণে বুঝতে পারল না তাহলে আখেরাত ও জান্নাত-জাহান্নাম অযৌক্তিক হয়ে যায়। কারণ স্থূলবুদ্ধির ব্যক্তিটি তখন বলার সুযোগ পাবে- 'আল্লাহ আমি তো এতটা মেধাবী ছিলাম না যে, তোমার দীনকে বুঝতে পারি।' সহায়সম্বলহীন মানুষটি বলার সুযোগ পাবে, 'আল্লাহ আমি এতই হতদরিদ্র ছিলাম যে, রিজিক সন্ধান করতেই অধিকাংশ সময় কেটে গেছে, তোমার দীনকে বোঝার জন্য মাদ্রাসা বা ভার্সিটিতে লেখাপড়া করার সুযোগ আমি পাই নি। তাহলে কোন দোষে আমাকে শাস্তি দিচ্ছ?' কাজেই আল্লাহর প্রেরিত দীন এমন হতে পারে না যেটা কেবল প্রখর বুদ্ধিমত্তার মানুষরা বুঝবে আর অন্যরা বুঝবে না। এমনও হতে পারে না যেটা বোঝার জন্য জীবনের বড় একটি সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, অন্য কোনো মাধ্যমে ব্যয় করতে হয়। একটা মানুষের দীন বুঝতে শিখতেই যদি চল্লিশ বছর যায় তবে সে তা পালন করবে কবে? ইসলাম যে তেমনটা নয় তার সাক্ষ্য আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। সুরা কামারে অন্তত চারটি জায়গায় তিনি বলেছেন আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। এবং আল্লাহর রসুল বলেছেন, 'নিশ্চয়ই দীন হচ্ছে সহজ-সরল'' (আহমাদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ)। মুয়াজ ও আবু মুসাকে (রা.) ইয়ামানে প্রেরণের প্রাক্কালেও আমরা রসুলকে ঐ সহজ-সরলতার কথাই বলতে শুনি, 'তোমরা জনগণের কাছে

ধর্মীয় বিষয়গুলো সহজ করে তুলে ধরো, কঠিনরূপে নয়।' প্রশ্ন হচ্ছে, সেই সহজ-সরল ইসলামটা তাহলে কী যেটা সবধরনের বুদ্ধিমত্তার মানুষ সহজেই বুঝে যাবে?

এর উত্তর পেতে আমাদেরকে আবারও ফিরে যেতে হবে নবী-রসুলদের জীবনীতে। তারা যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাসকারী, বিভিন্ন সমস্যা-জটিলতায় ভারাক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে কোন্ সাধারণ কথাটির দিকে আহ্বান করেছেন? আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষনবী (সা.) পর্যন্ত আল্লাহ যে জীবনবিধান মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন, স্থান, কালভেদে সেগুলোর নিয়ম-কানুনের মধ্যে প্রভেদ থাকলেও সর্বক্ষণ ভিত্তি থেকেছে একটি। সেই ভিত্তিটি হচ্ছে তওহীদ, একমাত্র প্রভু, একমাত্র বিধাতা (বিধানদাতা) আল্লাহ, যার আদেশ নির্দেশ, আইন-কানুন ছাড়া অন্য কারো আদেশ, নির্দেশ, আইন-কানুন কিছুই না মানা। একেই আল্লাহ কোর'আনে বলছেন দীনুল কাইয়্যেমা। আল্লাহ মানুষের কাছে এইটুকুই মাত্র চান। কারণ তিনি জানেন যে, মানুষ যদি সমষ্টিগতভাবে তিনি ছাড়া অন্য কারো তৈরি আইন-কানুন, হুকুম-বিধান না মানে, শুধু তারই আইন-কানুন মানে তবেই শয়তান পরাজিত হবে। কেবলমাত্র তওহীদ মেনে নিলেই শয়তান অশান্তি, অন্যায় আর রক্তপাত অর্জনে ব্যর্থ হবে এবং মানুষ সুবিচারে, শান্তিতে (ইসলামে) পৃথিবীতে বসবাস করতে পারবে, আল্লাহর চাওয়া এটাই। কত সহজ। কাইয়্যেমা শব্দটা এসেছে কায়েম থেকে যার অর্থ চিরন্তন, শাশ্বত, সনাতন। আল্লাহ এই দীনুল কাইয়্যেমার কথা উল্লেখ করে বলেন- 'এর বেশি তো আমি আদেশ করিনি' (বাইয়্যিনাহ: ০৫)। 'এর বেশি তো আমি আদেশ করিনি' তিনি বলছেন এই জন্য যে, তিনি জানেন যে, ঐটুকু করলেই অর্থাৎ তার বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান মানুষ অস্বীকার করলেই মানবজাতির মধ্যে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সামান্য দাবিটুকুই তিনি মানুষের কাছে আদম থেকে আজ পর্যন্ত করে আসছেন। পূর্ববর্তী বিকৃত জীবন-ব্যবস্থাগুলোতেও আল্লাহর দাবি ছিল ঐ সহজ সরল দাবি- দীনুল কাইয়্যেমা, তওহীদ। ভারতীয় ধর্মের অনুসারীদের তারা কোন ধর্মে বিশ্বাসী জিজ্ঞাসা করলে তার জবাব দেবেন সনাতন ধর্ম। সনাতন এবং কাইয়্যেমা একার্থবোধক- যা চিরদিন প্রবাহমান, চিরন্তন ও শাশ্বত, এবং তা ঐ তওহীদ। এর গুরুত্ব এত বেশি যে একে আল্লাহ আমাদের জন্য শুধু প্রতি সালাতে নয় প্রতি রাকাতে অবশ্য করে দিয়েছেন সুরা ফাতেহার মধ্যে। "আমাদের সেরাতুল মুস্তাকীমে চালাও" মোস্তাকীম অর্থ সহজ, সরল ও শাশ্বত। আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা নেই, যে ব্যাপারে আল্লাহর কোনো কথা আছে সেখানে অন্য কারোটা মানব না- ব্যস, এই কথাটি বোঝার জন্য কি আল্লামা বা মহাপণ্ডিত হতে হয়? যে কেউ যে কোনো বুদ্ধিমত্তার মানুষই এই সাধারণ অথচ মহাগুরুত্বপূর্ণ কথাটি বুঝতে সক্ষম এবং বুঝতে সক্ষম বলেই আল্লাহ এখানে কোনো ছাড় রাখেন

নি, এই সাক্ষ্য না দিলে তার ব্যক্তিজীবনের কোনো আমলই আল্লাহ গ্রহণ করবেন না, অন্যদিকে কেবল এই সাক্ষ্যটুকু দিলেই তার ব্যক্তিজীবনের যত গুনাহই থাকুক তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে যে কথা আল্লাহও বলেছেন, আল্লাহর রসুলও বলেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সহজ-সরল ইসলাম আজ কোথাও নেই। দীনুল কাইয়েমা হারিয়ে দীনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিশ্লেষণের ফলে সহজ-সরল ইসলাম বিকৃত হয়ে এতই জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে যে, সাধারণ জনগণ দূরে থাক, একজন প্রখর বুদ্ধিমত্তার মানুষের পক্ষেও এত কিতাবের বোঝা বহন করে এক জীবনে সম্পূর্ণ দীন শেখা সম্ভব নয়, পালন করাতো পরের বিষয়।

এখন আমাদের করণীয় কী?

স্বল্প পরিসরের এই পুস্তিকায় আমরা চেষ্টা করেছি ১৩০০ বছরের বিকৃতির জঞ্জাল সরিয়ে আল্লাহর দেওয়া হেদায়াহ, সেরাতুল মোস্তাকীমকে পাঠকদের সামনে তার অনাবিলরূপে তুলে ধরতে। জানি না কথাগুলো পাঠকদের হৃদয়ে কতটা নাড়া ফেলতে পেরেছে। কিন্তু সত্য হচ্ছে, আজকে মানবজাতির এই ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ছুটে চলা মুসলিম নামক জাতিটি যদি পরিত্রাণের পথ সন্ধান করে তাহলে একমাত্র পথ হচ্ছে 'তওহীদ'। এটাই সেরাতুল মোস্তাকীম, সহজ-সরল পথ, যার প্রার্থনা আমরা প্রতি ওয়াক্ত নামাজের প্রতি রাকাতে করে থাকি এই বলে যে, 'হে আল্লাহ আমাদেরকে সহজ-সরল পথ (হেদায়াহ, Right way) দেখাও'। বিশ্বনবী একদিন সাহাবীদের সামনে একটি সোজা লাইন টানলেন, তারপর বললেন, এই হচ্ছে সহজ সরল পথ, সেরাতুল মোস্তাকীম। তারপর সেই সরলরেখা থেকে ডান দিকে কতকগুলো ও বাম দিকে কতকগুলো রেখা টেনে বললেন এইগুলো সেই সব পথ যেগুলোর দিকে শয়তান তোমাদের ডাকতে থাকবে। এই বলে তিনি কোর'আন থেকে সেই আয়াত পড়লেন যেটায় আল্লাহ বলছেন- নিশ্চয়ই এই হচ্ছে আমার সহজ সরল পথ। কাজেই এই পথে চল এবং থাক। অন্য কোনো পথে (মহানবী (দ.) ডাইনে বায়ে যে লাইনগুলো টানলেন সেগুলি) যেও না, গেলে তোমরা আমার পথ থেকে বিচ্যুত, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তিনি (আল্লাহ) তোমাদের আদেশ করছেন যাতে তোমরা অন্যায় থেকে বেঁচে ন্যায়ে থাকতে পারো।' (হাদিস- আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ (রা.) থেকে, আহমদ, নিসায়ী- মেশকাত)

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আল্লাহর রসুল আমাদেরকে যে সহজ-সরল পথে (তওহীদে) উঠিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন সেই সহজ-সরল পথে আমরা খুব বেশিদিন থাকতে পারি নি। আকীদার বিচ্যুতির কারণে দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি ও তার ফলে অনৈক্য করতে করতে এই জাতি সত্যের মহাসড়ক থেকে বহু আগেই বিচ্যুত হয়ে মিথ্যার অন্ধকার অলিগলিতে ঢুকে পড়েছে। শয়তান বহু শতাব্দী আগেই

আমাদেরকে সেরাতুল মোস্তাকীম ভুলিয়ে দিয়ে ডাইনে-বাঁয়ের লাইনগুলোতে ছিটকে দিয়েছে। আজ এক আল্লাহ, এক রসুল, এক কিতাবে বিশ্বাসী অখণ্ড উম্মতে মোহাম্মদী হাজার হাজার খণ্ডে বিভক্ত এবং এই প্রত্যেকটি খণ্ডের কাছে ইসলাম ভিন্ন ভিন্ন রকম। হাজার হাজার পীর রয়েছেন, তাদের হাজার হাজার তরিকা। একটির সাথে আরেকটির আকীদাগত, পদ্ধতিগত তফাৎ তো আছেই, পোশাক আশাক খাদ্যাভ্যাস পর্যন্ত আলাদা। হাজার হাজার রাজনৈতিক দল রয়েছে, একটির সাথে আরেকটির আদর্শিক দূরত্ব আকাশ পাতাল। ধর্মভিত্তিক দলের অভাব নেই, যাদের একটির সাথে আরেকটির আকীদা মেলে না। এক আলেম অপর আলেমকে কাফের ফতোয়া দেন, এক দল অপর দলকে গোমরাহ, মুরতাদ, অমুসলিম ঘোষণা দেয়। এছাড়াও মাদ্রাসাভিত্তিক, সংস্থাভিত্তিক, মসজিদভিত্তিক, উদ্দেশ্যভিত্তিক মতপার্থক্য ও বিভক্তির কোনো শেষ নেই। পরিহাসের বিষয় এই যে, সেরাতুল মোস্তাকীম হারিয়ে বিভিন্ন ফেরকা, মাযহাব, তরিকা ইত্যাদির কানাগলিতে ঢুকে পড়েও এদের আত্মতৃপ্তিতে এতটুকু ভাটা পড়ে নি। তারা প্রত্যেকেই ভাবছে একমাত্র তারাই সঠিক পথে আছে, অন্যরা পথভ্রষ্ট, জাহান্নামী। শত যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝিয়ে অন্য ধর্মের একজন মানুষকে মুসলিম বানানো বা একজন মুসলিমকে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত করা কতটা কষ্টসাধ্য? তার চেয়েও কষ্টসাধ্য এই মুসলিম নামক জাতির মধ্যে থেকে একজন শিয়াকে সুন্নি বানানো কিংবা সুন্নিকে শিয়া বানানো এবং একই কথা প্রযোজ্য সমস্ত ফেরকা, তরিকার সম্বন্ধে। এই যে ইসলামের এত রূপরেখা তৈরি হলো, জান্নাতে যাবার পথ সবাই নিজের মত করে বানিয়ে নিল, প্রকৃতপক্ষে জান্নাতে যাবার পথ কি এতগুলো? ইসলাম কি এত রকম? কখনই নয়।

আল্লাহর রসুল একটি অখণ্ড জাতি গঠন করেছিলেন। সেই জাতির মধ্যে কোনো দলাদলি ছিল না, ফেরকাবাজী ছিল না। ইসলাম কেমন তা সবার কাছেই একরকম ছিল। এই দ্বীনের আকীদা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তাদেরকে প্রশ্ন করা হলে সবার কাছেই একই উত্তর পাওয়া যেত। জাতি এক, লক্ষ্য এক, নেতা এক, দীন এক ও কর্মসূচি একটাই ছিল। তারা ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ ছিল বলেই ঐ জাতিটি যখন পৃথিবীময় আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বের হলো তখন তাদের অপ্রতিরোধ্য গতির সামনে তৎকালীন পৃথিবীর দুইটি সুপার পাওয়ার রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য দাঁড়াতেই পারল না, খড়কুটোর মত উড়ে গেল। একই সময়ে ঐ জাতি দুইটি পরাশক্তিকে ধুলিস্মাৎ করে দিল। জাতি সেটা পারল কারণ তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল আল্লাহর তওহীদের ভিত্তিতে, ফলে কোনো মতভেদ হয়ে ফেরকাবাজীতে রূপ নিতে পারে নি, জাতির সমস্ত শক্তি ছিল একত্রে, একই দিকে প্রবহমান। আর আজকে আমরা সমস্ত পৃথিবীর গোলাম জাতি হয়েছি কারণ আমাদের মধ্যে তওহীদ নেই, ফলে ঐক্যও নেই, শক্তিও নেই। আগেই বলেছি

আল্লাহর রসুল মক্কায় নবুয়ত পাবার মুহূর্ত থেকে মানুষকে অবিশ্রান্তভাবে কেবল তওহীদের দিকে ডেকে গেছেন, অন্যকিছুর দিকে নয় এবং পরবর্তীতে অক্লান্ত সংগ্রাম করে তিনি যে জাতিটি সমগ্র আরব উপদ্বীপে গড়ে তুললেন সেটার ঐক্যের ভিত্তি প্রোথিত ছিল তওহীদে। সুতো যেভাবে তসবির দানাকে একত্রে সংযুক্ত রাখে তেমনি তওহীদ এই জাতির প্রত্যেক সদস্যকে এক নেতার অধীনে, এক লক্ষ্যে ও এক কর্মসূচিতে গ্রন্থিত রেখেছিল। একটা পর্যায়ে সুতোটি যখন কেটে গেল তসবির দানার মতই এই জাতি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে ভূমিতে গড়িয়ে পড়ল। জাতি আর জাতি রইল না। কোনো জাহাজকে যতক্ষণ রশি দিয়ে তীরে আটকে রাখা হয় ততক্ষণ কোনোকিছুই তাকে ভাসিয়ে নিতে পারে না। কিন্তু রশি কেটে দিলে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ এসে তাকে মহাসমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তওহীদের রশি কেটে যাবার পরে এই জাতির অবস্থা হলো তীরহারা জাহাজের মত। জাতি সেরাতুল মুস্তাকীমের তীর থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল এবং ফেরকাবাজী দলাদলির মহাসমুদ্রে হারিয়ে গেল। আরও পরে শত্রুর আক্রমণের মুখে পড়ল এবং সমস্ত জাহাজটাই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এখন ঐ ছিন্নভিন্ন ভাঙা অংশগুলো একটি সাথে আরেকটি ঠোকাঠুকি করে বাকি দুনিয়ার হাসির পাত্র হচ্ছে।

এই অবস্থায় যদি কেউ ভেবে থাকেন শতাধাবিচ্ছিন্ন এই জাতির সদস্যরা একদিন সবাই শিয়া হয়ে যাবে বা সবাই সুন্নি হয়ে যাবে বা সবাই আহলে হাদীস হয়ে যাবে বা সবাই আহলে কুরান হয়ে যাবে এবং এইভাবে তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে তাহলে তিনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন। বহু শতাব্দীর অনৈক্য, মতভেদ ও পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ অনেক পূর্বেই সেই পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। কাজেই প্রয়োজন এমন একটি ঐক্যসূত্রের যেটায় ফেরকা-মাজহাব নির্বিশেষে সকলেই ঐক্যবদ্ধ হতে পারবেন এবং সেটা একমাত্র তওহীদ। একমাত্র তওহীদই দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠত্ব আর পরকালে জান্নাত এনে দেবে। তওহীদের এই ঐক্যসূত্র দিয়ে আল্লাহর রসুল আরবের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত আইয়্যামে জাহেলিয়াতের মানুষগুলোকে যখন শত্রুতা ভুলিয়ে একে অপরের ভাই বানাতে পেরেছিলেন তখন আমাদের নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। বর্তমানের অনৈক্য-সংঘাতে জর্জরিত মানুষগুলোও তওহীদের বৈপ্লবিক ঘোষণার মধ্য দিয়েই হারিয়ে ফেলা সেরাতুল মোস্তাকীমে ফিরে আসতে সক্ষম হবে ইনশা'আল্লাহ।

সহজ-সরল একটি কথা 'আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা নেই'। কোন্ পীর সাহেব কী বললেন, কোন্ মৌলভী সাহেব কী বললেন, কোন্ রাজনৈতিক নেতা কী বললেন সেটা নয়, আল্লাহ যা হুকুম করেছেন সেটা গ্রহণ করব এবং আমাদের নেতা হবেন একজন, লক্ষ্য হবে একটি, কর্মসূচিও হবে একটি- এই মূলমন্ত্রের ভিত্তিতে আমরা হব ঐক্যবদ্ধ জাতি। আল্লাহ কোনো মন্দকাজের হুকুম দেন না

(আরাফ: ২৮)। কাজেই আল্লাহর হুকুমের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবার অর্থ যাবতীয় ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, হিংসা-বিদ্বেষ-হানাহানি ভুলে যাওয়া এবং সাক্ষ্য দেওয়া যে, আমরা ব্যক্তিজীবনে কে কোন ফেরকায় থাকব, কে কোন মাজহাব মানব, কে তারাবির নামাজ বারো রাকাত পড়ব আর কে বিশ রাকাত পড়ব, কে আল্লাহকে সাকার বিশ্বাস করব আর কে নিরাকার বিশ্বাস করব, কে রসুলকে নূরের তৈরি বিশ্বাস করব আর কে মাটির তৈরি বিশ্বাস করব, কে দোয়াল্লিন পড়ব আর কে যোয়াল্লিন পড়ব, কে কওমীতে পড়ব কে আলীয়াতে পড়ব- এই সব বিষয়কে ব্যক্তিজীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে সমষ্টিগত জীবনে আমরা সবাই মিলে ঘোষণা দিলাম যে, আমরা আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো হুকুম মানবো না, আমরা থাকব যাবতীয় ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ।

মুসলিমদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য পৃথিবীময় যে মহাযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে, তা থেকে রক্ষা পেতে জাতির একটি অংশ আমেরিকার দ্বারস্থ হচ্ছে, আরেকটি অংশ রাশিয়ার দ্বারস্থ হচ্ছে, দুর্বল দেশগুলো অধিকতর শক্তিশালী দেশের ছত্রছায়া লাভ করতে পারলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। শক্তিধররা তার চেয়েও শক্তিধরের কৃপা ভিক্ষা করছে। অথচ তারা যদি মো'মেন থাকত, ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারত তাহলে তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হতেন। তাদের হাতেই থাকত পৃথিবীর কর্তৃত্ব। এই সত্যটা এই জাতিকে কে বোঝাবে? তাদেরকে কে বলে দেবে যে, 'তোমরা যাদেরকে সুরক্ষাদাতা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছো এই সুরক্ষাদাতারাই একদিন তোমাদেরকে ধ্বংস করবে, যেভাবে তারা ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়া, ইয়েমেন, আরাকান, ফিলিস্তিন ধ্বংস করেছে। তোমাদের সাহায্যকারী অভিভাবক আমেরিকাও না, রাশিয়াও না, সৌদি আরবও না, ইরানও না। মুসলিমদের একমাত্র অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন এবং তিনিই যথেষ্ট। কিন্তু আল্লাহ তো কোনো বিচ্ছিন্ন, খণ্ড-বিখণ্ড, নিজেদের মধ্যে হানাহানি-মারামারিতে লিপ্ত ও আত্মকেন্দ্রিক-স্বার্থপর জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করেন না। আল্লাহ কেবল তাদেরকেই সাহায্য করেন যারা জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে (হুজরাত: ১৫) এবং আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় না (ইমরান ১০৩)। কেবল সাহায্যই নয়, এই অবিচ্ছিন্ন জাতিকে আল্লাহ নিশ্চিত বিজয়ের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন (ইমরান: ১৩৯)।'

আজ আকীদাগত ও ফেরকাগত মতানৈক্য খুঁজতে গেলে এই জাতির মধ্যে অসংখ্য পাওয়া যাবে এবং যতই এর মধ্যে প্রবেশ করা হবে ততই জাতির মুক্তির সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত হয়ে উঠবে। কাজেই বহু শতাব্দীর ওইসব চর্বিত চর্বণ দূরে সরিয়ে রেখে আসুন মিলগুলোর দিকে নজর দিই। আমরা যে ফেরকারই হই, যে মাজহাবেরই হই, যে দলেই হই- আমরা এক আল্লাহ, এক রসুল, এক কিতাবের

অনুসারী তো? যেখানে আল্লাহ ও রসুল অসংখ্যবার বলেছেন, আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতা হিসেবে গ্রহণ করে নিলে চুরি ও ব্যভিচারের মত মহাপাপও মানুষকে জান্নাত থেকে ফেরাতে পারবে না, সেখানে দীনের মাসলা-মাসায়েল, খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মতভেদ করে ঐক্যবদ্ধ না হতে পেরে পুরো জাতিই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া কতটা বোকামি? আর কত লক্ষ নিরপরাধ মুসলমানের রক্তে ধরণী সিক্ত হলে আমাদের এই অন্ধত্ব ঘুঁচবে? আর কত লক্ষ মুসলিম মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমাদের হুঁশ ফিরবে? আর কত লক্ষ নিষ্পাপ শিশুর প্রাণ ঝরতে দেখলে আমরা লজ্জিত হব?

আল্লাহ সত্যনিষ্ঠ মানুষকে তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবার তওফিক দান করুন।